# যুবক বাঙলার অর্থশাস্ত্র

-০—

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

ঢাকা জেলার যুবক-সম্মেলনে অর্থনৈতিক বিভাগের
সভাপতির অভিভাষণ,

১৯-২১ আগষ্ট ১৯২৭

# সূচীপত্র

বঙ্গীয় ধন-বিজ্ঞান-পরিষৎ

১। ধন-বিজ্ঞানের গবেষণা-প্রণালী

২। রাষ্ট্র-শক্তির আর্থিক সদ্ব্যবহার

ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা

১। বিদেশে বাঙালী বণিক

২। ছোট খাটো রেলপথ

৩। নৌকায় এঞ্জিন

৪। মোটর বাস

৫। যন্ত্রপাতির ফ্যাক্টরি

৬। জমিদারের নয়া আয়

৭। খদ্দরে টাকা রোজগার

৮। রকমারি ব্যাঙ্ক-ব্যবসা

৯। কারবার-পরিচালনা

# যুবক বাঙলার অর্থ-শাস্ত্র

## আর্থিক আইন-কানুন ও স্বদেশ-সেবা

সত্য কথা বলিবার ক্ষমতা আমার আছে কিনা জানিনা। কিন্তু অপ্রিয় কথা বলিতে আমি ওস্তাদ।

প্রথমতঃ, বিদেশ হইতে পুঁজি আমদানি করিয়া ভারতের ধন-সৃষ্টিতে আর বেকার-সমস্যায় সাহায্য করা আমি বিচক্ষণ স্বদেশ-সেবকদের অন্যতম কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া থাকি। তাহার অন্যান্য সুফলের ভিতর আমি দেখিতে পাই যে, চাষীরা অল্পমাত্র জমির উপর নির্ভর করিয়া গণ্ডা গণ্ডা লোকের ভরণ-পোষণ করিতে আর বাধ্য হইবে না, জেলায় জেলায় অসংখ্য আধুনিক প্রণালীর শিল্প-কেন্দ্র গড়িয়া উঠিবে, মজুর আর মধ্যবিত্ত নামক দুই শ্রেণীর লোক-বল, ধন-বল, জ্ঞান-বল আর চরিত্র-বল বাড়িতে পারিবে আর সমাজের সর্ব্বত্র যন্ত্র-নিষ্ঠার জয়জয়কার চলিতে থাকিবে।

দ্বিতীয়তঃ, গবর্ণমেণ্টের হাতে জনগণকে বেশী পরিমাণে ট্যাক্স দিতে উৎসাহিত করা আমি স্বরাজ-সেবকদের অন্যতম কর্ত্তব্য সমঝিয়া থাকি। কেননা স্বরাজের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেশহিতকর নানাপ্রকার কাজে টাকা খরচ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে বাধ্য করানো আবশ্যক।

তৃতীয়তঃ, আঠার পেন্সের রূপেয়ার স্বপক্ষে আমি প্রথম হইতেই আছি। তাহাতে বাঙলার চাষীর ক্ষতি আমি দেখিতে পাই না। চতুর্থতঃ, সরকারী কৃষি-কমিশনের বিপক্ষে যুক্তি দেখানো আমার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। আর পঞ্চমতঃ, আজকাল যে "রিজার্ভ-ব্যাঙ্ক" প্রতিষ্ঠার সম্বন্ধে আইনের কথা উঠিয়াছে তাহার স্বপক্ষেই আমার চিন্তা খেলিতেছে।

বোল্‌শেভিক রুশিয়ায় "রিজার্ভ ব্যাঙ্ক"টা "সরকারী" প্রতিষ্ঠান, ইতালিতেও তাই। অর্থাৎ অংশীদার নামক জীব এই দুইটার শাসনকর্ত্তা নয়।

অপরদিকে ইংল্যণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, জাপান, আমেরিকা ইত্যাদি দেশের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান। দেখা যাইতেছে যে, দুনিয়ায় সরকারী এবং বে-সরকারী দুই প্রকার রিজার্ভ বাঙ্কই চলিতেছে। কাজেই ভারতে যদি বিলাতী-জার্ম্মান আদর্শের বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান কায়েম হয় তাহা হইলে একটা মারাত্মক কিছু সয়তানি ঘটিবে বলিয়া আমি সন্দেহ করি না।

তবে ইহার শাসনে ও কর্ম্ম-পরিচালনায় ভারত-সন্তানের হাত বেশী থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ভারতবর্ষের অনেক-কিছুতেই "ইণ্ডিয়ানিজেশ্যন" বা ভারতীকরণ এখনো সুদূর ভবিষ্যতের কথা। কাজেই একমাত্র ইণ্ডিয়া-নিজেশ্যনের ওজরে রিজার্ভ-ব্যাঙ্ককে খাড়া হইতে না দেওয়া আমার মতে অতিমাত্রায় চরম-পন্থিতা। সাধারণতঃ, চরমপন্থিতার বিরুদ্ধে আমার বক্তব্য কিছু নাই। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এই চরমপন্থিতা বাঞ্ছনীয় কিনা সন্দেহ।

কিন্তু ব্যাঙ্কটাকে অন্যান্য তরফ হইতেও শাসন হিসাবে উন্নত করা সম্ভব। প্রস্তাবে আছে যে, মাত্র চারটা "ভারতীয়" ব্যাঙ্কের বাণিজ্যিক কাগজপত্র এই ব্যাঙ্কে স্বীকার করা হইবে। অথচ ২২টা বিদেশী ব্যাঙ্ক এই অধিকার ভোগ করিবে। এই বিধানের বিরুদ্ধে আমি বলিতে চাই যে, অন্ততঃ গোটা চল্লিশেক "ভারতীয়" জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্ককে এই অধিকার দেওয়া উচিত। অধিকন্তু ভারতের প্রাদেশিক কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কগুলারও এই অধিকার থাকা বাঞ্ছনীয়।

শাসন-সংক্রান্ত এই ধরণের কয়েকটা দফা বাদ দিলে রিজার্ভ-ব্যাঙ্কের প্রস্তাবে যে সকল সর্ত্ত আছে তাহার অধিকাংশই আমার বিবেচনায় যুক্তি-সঙ্গত এবং গ্রহনীয়। বিশেষতঃ, ইয়োরামেরিকার চরম অভিজ্ঞতার সুফল এই ব্যাঙ্কের নোট-জারী আর নোটে-সোনায় সম্পর্ক সম্বন্ধে কায়েম করিবার ব্যবস্থা আছে। সহজে এক কথায় বলা যাইতে পারে যে, নোট সম্বন্ধে ফরাসী কায়দা ত বর্জ্জিত হইয়াছেই, এমন কি বিলাতী রীতিও গ্রহণ করা হয় নাই। প্রস্তাবে আছে জার্ম্মান-জাপানী রীতি।

বিদেশী পুঁজির প্রয়োজনীয়তাই হউক অথবা প্রস্তাবিত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিষয়ক বিলই হউক,—কোনো বিষয়েই বিপুলায়তন কেতাব লিখিবার সময় বা সুযোগ আমার জুটে নাই। তবে নানা উপলক্ষ্যে সিদ্ধান্তগুলা কয়েক কথায় প্রচার করা গিয়াছে।

## মতামতের অনৈক্য

বুঝা যাইতেছে যে, অন্যান্য কর্ম্মক্ষেত্রের মতন আর্থিক আইন-কানুন বিষয়েও আমার মতামত গুলা লোক-প্রিয় নয়। সর্ব্বত্রই আমি কিছু বেআড়া রকমের কথা বলিয়া থাকি।

কাজেই আমার নিকট হইতে আজও হয়ত পুরাপুরি অপ্রিয় কথাই বাহির হইবে। অন্যান্য দুনিয়ার মতন আর্থিক দুনিয়ায়ও বহুসংখ্যক মতভেদ আর দলাদলি অবশ্যম্ভাবী। আমি অবশ্য দল পুরু করিবার মতলব রাখি না। মতটা জাহির করিবার স্বাধীনতা পাইলেই কৃতার্থ হইয়া থাকি।

আজ যদি ভারতবর্ষ স্বাধীন কিম্বা স্বরাজশীল থাকিত তাহা হইলেও একাধিক পরস্পর-বিরোধী আর্থিক মত বাজারে চলিত। কাজেই যখন-তখন যেখানে-সেখানে যে-সে মতকে দেশ-হিতকর অথবা দেশের অনিষ্টকারক বলিতে গেলে অবিচার করা হইবে।

আজ ভারতে স্বরাজ বা স্বাধীনতা নাই বলিয়া সর্ব্বদা দেশশুদ্ধ লোককে কোনো এক মতের স্বপক্ষে "দেশের নামে" বিনা বাক্যব্যয়ে রায় দিতে উদ্বুদ্ধ করা স্বদেশ-সেবার লক্ষণ না হইতেও পারে। তাহাতে "দেশের স্বার্থ" রক্ষিত হইবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু বহুসংখ্যক বিভিন্ন শ্রেণীর উপর অত্যাচার ও জুলুম ঘটিতে বাধ্য। দুএকটা দৃষ্টান্ত দিতেছি।

সাধারণতঃ আমরা না ভাবিয়া-চিন্তিয়া চাষী আর মজুর এই দুই শ্রেণীর লোককে এক গোত্রের অন্তর্গত বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত। কিন্তু এই দুইএর স্বার্থ অনেক সময়েই একরূপ নয়। বিদেশী মাল বয়কট সুরু হইলে অথবা তাহার উপর চড়া হারে শুল্ক চাপাইলে খরিদ্দার হিসাবে চাষীদের ক্ষতি। কিন্তু যে সকল স্বদেশী ফ্যাক্টরীতে সেই সব মাল তৈয়ারী হয় বা হইবার সম্ভাবনা তাহার মজুরেরা তাহাতে বিচলিত হইবে কেন?

কাজেই চাষী আর মজুরকে অনেক সময়ে দুই বিভিন্ন স্বার্থের লোক অতএব দুই বিভিন্ন পথের পথিক দেখিতে পাওয়া স্বাভাবিক। আবার কলের মালিকেরা যে আইন বা কর্ম্মপ্রণালীকে দেশহিতকর বিবেচনা করেন তাহাকে মজুরেরাও "দেশের পক্ষে" মঙ্গলজনক বিবেচনা করিবে এরূপ কথা বলা চলে না।

তারপর, তথাকথিত মধ্যবিত্তের মতি, গতি, স্বার্থ বা নীতি কিরূপ? এই শ্রেণীর লোকেরা আজ হয়ত জমিদারের পথকে, কাল হয় ত ফ্যাক্টরি-মালিকের পথকে, "দেশের পথ" বিবেচনা করিতে পারে। এমন কি কখনও বা চাষীকে আবার কখনও বা মজুরকে তোয়াজ করা তাহাদের স্বার্থ-মোতাবেক বা যুক্তি-মাফিক দাঁড়াইয়া যাওয়া অসম্ভব নয়। সুতরাং জোর জবরদস্তি করিয়া কোনো দাগ-দেওয়া বিশিষ্ট মতকে স্বদেশসেবার মত বা স্বরাজের পথরূপে প্রচার করা গা-জুরি মাত্র। কোনো ব্যক্তি-বিশেষকে, শ্রেণী-বিশেষকে বা দল-বিশেষকে দেশের একমাত্র বা প্রধান প্রতিনিধি বিবেচনা করা পুরাপুরি অন্যায়।

## আর্থিক জীবনে ভাঙন-গড়ন

যৌবনশক্তির চাষ চালাইয়া বাঙলাদেশের যে কয়টা জেলা বাঙালী জাতিকে বর্ত্তমান জগতে বরেণ্য করিয়া তুলিয়াছে তাহার ভিতর ঢাকার ইজ্জৎ খুব বেশী। যুবক বাঙলার ১৯০৫-৭ সন ঢাকার আবহাওয়ায় প্রচুর পরিমাণে পুষ্ট হইয়াছিল। আর এই বিশ-বাইশ বৎসর ধরিয়া বাঙালী জাতি দুনিয়ায় যাহা কিছু করিয়া আসিতেছে তাহার প্রধান ফোয়ারা সেই ১৯০৫-৭ সনের কর্ম্ম ও চিন্তারাশি।

সেই যুগের সাধনাকে সিদ্ধির পথে লইয়া যাইবার জন্য যুবক বাঙলা দেশে বিদেশে নতুন নতুন কর্ম্মক্ষেত্র গড়িয়া তুলিয়াছে। বাঙালীরা বহির্ব্বাণিজ্যে কিছু কিছু নজর দিতেছে। বাঙালীরা শিল্প-কারখানা কায়েম করিতেছে। উন্নত বৈজ্ঞানিক চাষ-আবাদের চেষ্টা বাঙলায় দেখা যাইতেছে। বাঙালীর তাঁবে "যৌথ" ব্যাঙ্ক আর "সমবেত" ব্যাঙ্ক কতকগুলা মাথা খাড়া করিয়াছে।

বাঙলার বাহিরে যুবক বাঙলা বাঙালী যৌবনশক্তির কীর্ত্তিস্তম্ভ গাড়িতেছে। ভারতের বাহিরেও বাঙালী সাঁতার কাটিয়া গিয়া আমেরিকার প্রদেশে প্রদেশে বর্ত্তমান ভারতের প্রাণ প্রতিষ্ঠিত করিতেছে। জাপানী সমাজে বাঙালীর যৌবনশক্তি ভারত-সুহৃৎ ঢুঁড়িয়া বাহির করিতেছে। ফ্রান্সে, জার্ম্মাণিতে, ইতালিতে, রুশিয়ায় সর্ব্বত্রই যুবক বাঙলা নবীন ভারতের কৃতিত্ব সম্বন্ধে জীবন্ত সাক্ষ্য দান করিতেছে। দুনিয়ার বড় বড় চিন্তা-কেন্দ্রে আর কর্ম্মকেন্দ্রে যুবক বাঙলা একটা "বৃহত্তর ভারত" কায়েম করিতে পারিয়াছে। বর্ত্তমান ভারতের জীবনস্রোত আজ জগতের মজুর, পুঁজিপতি,

শিল্পী, বিজ্ঞানসেবী, সাংবাদিক, রাষ্ট্রবীর ইত্যাদি নানা শ্রেণীর নরনারী মহলে গিয়া ঠেকিয়াছে। দুনিয়ার অনেক প্রকার আধুনিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান-আন্দোলনের সঙ্গে ভারতের স্বাধীন ও সমানভাবে জীবন-বিনিময় সাধিত হইতেছে।

প্রবীণেরা যাহা কখনো কল্পনা করিতে পারিত না ১৯০৫-৭ সনের নবীনেরা সেই স্বপ্নাতীত খেয়ালগুলাও কার্য্যে পরিণত করিয়া ছাড়িয়াছে। যুবক বাঙলার এই অসাধ্য-সাধন সম্ভব হইল কি করিয়া? যৌবন-শক্তির যুক্তি-শাস্ত্রই এই অসাধ্য-সাধনের জন্য দায়ী। ভাঙন আর গড়ন হইতেছে সেই যুক্তিশাস্ত্রের মোটা কথা।

দুনিয়া সম্বন্ধে যুবারা ভাবিত,—
সূর্য্য ভাঙিয়া গড়েছে পৃথিবী, পৃথিবী ভাঙিয়া গড়েছে চাঁদ,
আগ্নেয়গিরি ভাঙিয়াছে ধরা,—নদী ভাঙিয়াছে গিরির বাঁধ।
ধাতুরে গ্রাসিয়া বাঁচিতেছে গাছ, জীব বাঁচিতেছে গাছেরে খেয়ে,
অতীতে গ্রাসিয়া হল বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎও বর্ত্তমানেরই মেয়ে।
ব্যক্তিমাত্রে বহুত্বময়, নীতিধর্ম্ম বদলায় ক্ষণে ক্ষণে ;
জীবনের প্রাণ চির-বিপ্লব,—স্থিতি নাহি তাহার পুরাতনে।
ভাঙার দাগ ত চারিধারে দেখি, দুনিয়াতে হেরি নিস্ফল সব ,
সবই অপূর্ণ বিশ্ব ব্যাপিয়া, শেষ পরিণাম শুধু পরাভব।
হিন্দু-গ্রীক ছাড় ; ডারুইন্-কেপ্লর,—তারাই কল্কে পায়না হে !
রেডিয়াম এসে বাষ্প-তড়িতে ভিটেমাটি-ছাড়া করিল যে !
পরাজয়ই বটে উন্নতি, আর হারিল যাহারা তারাই বীর,
পরাজিত বীর কমেনা যাদের, অমরতা ভাগ্যে সেই জাতির।
দুনিয়ার গায়ে লেখা আছে দুই, বিপ্লব,—বিফলতা,
বাড়াও বিশ্বে শত বৈচিত্র,—তাহাই সার্থকতা।

যুবক বাঙলা পরাজয় আর বিফলতাকে ডরায় নাই। অসাধ্য সাধনই তাহার একমাত্র মূলমন্ত্র ছিল। এই অসাধ্য সাধনের চিন্তাবীর ও কর্ম্মবীরেরা অতীতের তোয়াক্কা রাখে নাই, অভিজ্ঞতার ধার ধারে নাই, ফেল-মারার ভয়ে জড় সড় হয় নাই। তাহাদের বিচারে বর্ত্তমানই একমাত্র

কাল। ভবিষ্যৎকে গোলাম করিয়া রাখিবার জন্ম বর্ত্তমানের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তিই ছিল তাহাদের জীবন-দর্শন।

আজ ১৯২৭ সন। অসাধ্য-সাধন আর বর্ত্তমান-নিষ্ঠা ধাপের পর ধাপে এক কথঞ্চিৎ উন্নত ঠাঁইয়ে আসিয়া খাড়া হইয়াছে। বাঙলার যৌবন-শক্তি এই উঁচু ঠাঁইয়ের মাপে বর্ত্তমান-নিষ্ঠ হইতে পারিবে কি? এই ঠাঁইয়ে দাঁড়াইয়া যুবক বাঙলা প্রবীণদের দিকে তাকাইয়া বলিতে সাহসী হইবে কি,—

"দুনিয়ার গায়ে লেখা আছে দুই,—বিপ্লব, বিফলতা,
বাড়াও বিশ্বে শত বৈচিত্র্য, তাহাই সার্থকতা?"

দুনিয়া আজ বাঙলার যৌবনশক্তিকে এই পরীক্ষায় ফেলিয়াছে। ভাঙন-গড়নের ক্ষমতা আছে কিনা তাহারই আবার যাচাই হইতেছে।

আজ অর্থশাস্ত্রের পালা। এখানে যাঁহারা উপস্থিত আছেন তাঁহাদের অনেকেই কেতাব-পুঁথির ধার ধারেন না। অনেকে আবার কেতাবের পোকা বিশেষ। কেহ বা কাজের লোক, খুবই ব্যস্ত। তাঁহারা যুক্তি-তর্কের ধাক্কায় সময় খরচ করিতে অনভ্যস্ত। আবার অনেকে হয়ত তার্কিক। "কামের কথা পরে হবে" বলিয়া তাঁহারা তর্কের খাতিরে তর্ক চালাইতেই সুপটু।

জীবন আমাদের এইরূপ বিভিন্নতাময়। কিন্তু সকলেই যৌবনের ভাঙন-গড়নে মাতিবার জন্ম এইখানে উপস্থিত হইয়াছি। আর্থিক জীবন সম্বন্ধে যে সকল চিন্তা-প্রণালী ও কর্ম্ম-প্রণালী এতদিন সনাতন ভাবে চলিয়া আসিয়াছে তাহার ভিতর কোন্‌টা গ্রহণীয় আর কোন্‌টাই বা বর্জ্জনীয় তাহার কিছু কিছু খতিয়ান করা আজকার উদ্দেশ্য। বিরাট বিশ্বকোষ ঘাড়ে বহিয়া আনি নাই। সকল কথা আলোচনা করা অসম্ভব। ক্ষমতারও বোধ হয় অভাব। আর যে সকল বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতেছে সেই সবও নেহাৎ স্থত্রাকারে আলোচিত হইবে। মোটা সিদ্ধান্তগুলা দেখানো হইবে মাত্র।

## গোটা কয়েক অর্থনৈতিক স্বীকার্য্য

যে ধরণের ধনবিজ্ঞান বা অর্থশাস্ত্র আমার মেজাজ-মাফিক তাহার কয়েকটা মূলসূত্র প্রথমেই বলিয়া রাখি। এইগুলা আমার নিকট নেহাৎ গোড়ার কথা,—স্বতঃসিদ্ধ বা প্রাথমিক স্বীকার্য্য বিশেষ।

## ১। ইতালি ও জাপানের অর্থনীতি

বিদেশের নজির, বিদেশী অভিজ্ঞতা আর বিদেশ-নিষ্ঠা যুবক বাঙলার আর্থিক ভাঙা-গড়ায় এক বিপুল শক্তি। কিন্তু বিদেশ ত এক বিরাট দুনিয়া। এই দুনিয়ার কোন্ কোন্ অঞ্চলের নজির ও অভিজ্ঞতা আমাদের পক্ষে আজকালকার আর্থিক ও সামাজিক অবস্থায় বিশেষরূপে কার্য্যকরী? আমার বিবেচনায় একদিকে ইতালিয়ান আর অপরদিকে জাপানী কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য বিষয়ক তথ্য ও তত্ত্ব আমাদের খুব বেশী কাজে লাগিবে। ইতালির আর জাপানের আর্থিক কর্ম্মপ্রণালী আর চিন্তাপ্রণালী বাঙলার ব্যবসায়ী মহলে আর ধনবিজ্ঞান-সেবীদের আবহাওয়ায় সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক।

কারণগুলা অতি সোজা। ইতালি ইয়োরামেরিকার "সভ্য" বা "উন্নত" বা "যন্ত্রনিষ্ঠ" বা "ধনশালী" দেশগুলার ভিতর নিকৃষ্ট। আর জাপান হইতেছে এই সকল বিষয়ে এশিয়ার সেরা।

ঘটনাচক্রে প্রাচ্য জাপান আর পাশ্চাত্য ইতালি সভ্যতার সিঁড়িতে প্রায় এক ধাপেই অবস্থিত। উভয়ের সমস্যাই একরূপ। উভয়েই আজও কৃষি-প্রধান অবস্থায় রহিয়াছে। উভয়কেই আস্তে আস্তে যন্ত্রনিষ্ঠ, ব্যাঙ্ক-নিষ্ঠ, শিল্প-নিষ্ঠ সমাজ-জীবনের কোঠায় উঠিতে হইতেছে। এই সিঁড়ির মাথায় অবস্থিত আজ তিন দেশ,—ইংল্যাণ্ড, জার্ম্মানি আর আমেরিকা। এই তিন দেশকে ধ্রুবতারা করিয়া জাপান আর ইতালি জীবন-সাধনায় ব্রতী রহিয়াছে। ফ্রান্সের ঠাঁই এই তিন দেশের কিছু নীচে।

এইখানেই ভারতের সঙ্গে ইতালির আর জাপানের আধ্যাত্মিক সংযোগ অতি নিকট। আজ আমরা ভারতে আর্থিক জীবনের যে ধাপে রহিয়াছি ইতালি আর জাপান ঠিক যেন তাহার পরের ধাপ। অর্থাৎ ইংল্যাণ্ড, জার্ম্মানি আর আমেরিকা ও ফ্রান্স পর্য্যন্ত "প্রোমোশ্যন" পাইতে হইলে যুবক ভারতকে আগে ইতালি-জাপান নামক আর্থিক-সামাজিক পুলটা পার হইয়া যাইতে হইবে।

## ২। আর্থিক স্বার্থ ও হিন্দু-মুসলমান

"হিন্দুর স্বার্থ" আর "মুসলমানের স্বার্থ" ইত্যাদি বোল আজকালকার বাঙলায় খুব শুনা যায়। কিন্তু খাওয়া-পরা আর টাকা-রোজগারের কর্ম্মক্ষেত্রে

এই ধরণের ধর্ম্ম হিসাবে স্বার্থ-ভেদ আমি স্বীকার করিয়া চলিতে অসমর্থ। আমার স্বীকার্য্য বা স্বতঃসিদ্ধ একদম অন্য ঢঙের।

যে-যে প্রণালী অবলম্বন করিলে বাঙলার চাষী, মজুর, কেরাণী, শিল্পী ও বণিক পরিবারগুলা দুই বেলা পেট পূরিয়া খাইতে পারিবে, শীতকালে গায়ে আলোয়ান জড়াইবে, গরমে-বর্ষায় ছাতা মাথায় দিবে, স্বাস্থ্যকর ঘর-বাড়ীতে শুইতে পারিবে, ইস্কুল-কলেজে পড়িতে পারিবে, অসুখ হইলে ডাক্তার-কবিরাজ-হাকিম ডাকিতে পারিবে আর সঙ্গে সঙ্গে কিছু টাকা জমাইয়া রাখিতেও পারিবে,—সেই প্রণালীগুলা বাঙালী-হিন্দুর পক্ষেও যা, বাঙালী-মুসলমানের পক্ষেও তাই।

ধন-বিজ্ঞানে জাতি-ভেদ, রক্ত-ভেদ, ধর্ম্ম-ভেদ, ভাষা-ভেদ নাই। এ হইতেছে যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগের মামলা। "সূচী-সংখ্যায়" ধরা পড়ে কোন্ লোকটা সুখে আছে আর কোন্ লোকটা দারিদ্র্য-সীমানার তলায় পড়িয়া আছে। দাড়িতে আর টিকিতে তফাৎ করা "ইণ্ডেক্স্ নাম্বারে"র কোষ্ঠীতে লেখা নাই। এই সনাতন, বিশ্বজনীন বিদ্যার পতাকা-তলে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই ঐক্য-বদ্ধ হইতে বাধ্য।

যদি অনৈক্য দেখা দেয়, সে অনৈক্য দাড়ি আর টিকির অনৈক্য নয়। সে অনৈক্য জীবন-যাত্রার মাপ-কাঠির অনৈক্য। তুমি বেশী খাইতে পাইতেছ, ভাল কাপড় পরিতেছে, তোফা বাড়ীতে বাস করিতেছ আর আমি এই সকল বিষয়ে ঘৃণ্য নগন্য জঘন্য জীবন যাপন করিতেছি, সেই অনৈক্য। অর্থাৎ ধনী-নির্ধনে, মজুর-মালিকে, চাষী-জমিদারে, কেরাণী-মনিবে অনৈক্য। এ সব অনৈক্য ধর্ম্মে ধর্ম্মে অনৈক্য নয়,—আর্থিক ও সামাজিক অনৈক্য। আর এই সকল নতুন ধরণের অনৈক্য নিবারণের দাওয়াইও আছে হরেক রকমের। সে কথা সম্প্রতি আলোচনা করিতেছি না।

## ৩। সভ্যতার গতি সহর-মুখো

বড় বড় সহর কিছুদিন পূর্ব্বে ইয়োরামেরিকায়ও ছিল না। পল্লী-জীবন, পল্লী-সভ্যতা, পাড়াগাঁয়ের আদর্শ ইত্যাদি মাল মান্ধাতার আমল হইতে সেদিন পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য সমাজেরও অতি পরিচিত বস্তু। কিন্তু মহানগরী নামক জনপদ বা জীবন-কেন্দ্র উনবিংশ শতাব্দীতে দেখা দিয়াছে। আর

তাহার ধারা বিংশ শতাব্দীতে জোরেই বহিতেছে। আমাদের ভারত এই পল্লী-নগর সমস্যায় আগাগোড়া পাশ্চাত্যেরই জুড়িদার। তবে আমরা কাল হিসাবে ইয়োরামেরিকার পেছনে পেছনে চলিতেছি—এই যা প্রভেদ। মাল হিসাবে ভারতে এবং পাশ্চাত্যে কোনো তফাৎ নাই।

বর্ত্তমান জগতের বিশেষত্ব দুনিয়া-নিষ্ঠা, সংসার-শ্রদ্ধা আর শক্তি-পূজা। নগর-জীবনে এই সবই পুঞ্জীকৃত। এই সবের সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ায় নানাপ্রকার সমাজ-সমস্যা দেখা দিয়াছে। লোক সংখ্যার বৃদ্ধি, নরনারীর যৌন সম্বন্ধ, বিবাহ-প্রথা, নগরের চৌহদ্দি ও বহর, নগরের গৃহ নির্ম্মাণ আর গৃহ-সংখ্যা,—এই সকল দফায় অনেক নতুন কিছু ঘটিতেছে। সরকারী ও বে-সরকারী লোকহিতের প্রতিষ্ঠান এই যুগেরই সন্তান। নগর-পরিচালিত শিল্প-কর্ম্ম, সেভিংস ব্যাঙ্ক, শিক্ষাকেন্দ্র, "যৌবন-ভবন" আর গ্রন্থশালা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানও অতিমাত্রায় নবীন চিজ।

এইসব চিজ "সেকেলে" ইয়োরোপে ছিল না। পশ্চিমা মুল্লুকেও এমন যুগ গিয়াছে যখন লড়াই চলিত চাষীতে আর শিল্পীতে। আর তখন প্রাচীন শিল্প-ওয়ালারা নবীন শিল্পপতির দলকে দেশের দুসমন বিবেচনা করিত। প্রাচীনেরা নবীনের কর্ম্ম-কৌশল আর সফলতা দূর হইতে দেখিয়া হা-হুতাশ করিত।

এই "সেকাল" কোনো প্রাগৈতিহাসিক যুগের সামিল নয়, একশ' দেড়শ' বৎসরের পুরাণো কাল মাত্র। বিলাতী ইতিহাসে ১৭৬০ সনকে সাধারণতঃ শিল্প-বিপ্লবের প্রথম তারিখ রূপে ধরিয়া লওয়া হয়। ফ্রান্সে আর জার্ম্মাণিতে শিল্প-বিপ্লবের তারিখ আরও ৫০।৬০।৭০ বৎসর পরের কথা। অর্থাৎ আজ কাল ২০।৩০.৫০ বৎসর ধরিয়া ভারতে কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যে যে সকল ওলট-পালট চলিতেছে সেই সব সাধিত হইয়াছে ইয়োরামেরিকায় আমাদের এক পুরুষ বা দুই পুরুষ আগে। দুনিয়ার সকল দেশেই শিল্প-বিপ্লবের সম-সম কাল প্রায় এক ধরণেরই কাল। আর সেই যুগটা পল্লী-নগরে ভাঙন-গড়নের যুগ।

## বাঙলার ঢাকা ও ফ্রান্সের র‍্যাঁস

একটা ছোট দৃষ্টান্ত দিতেছি।

১৮৭২ সনে ঢাকা সহরে ৬৮,৫৯৫ জন নরনারীর আস্তানা ছিল। ঠিক সেই বৎসর উত্তর-পূব ফ্রান্সের র‍্যাঁস্‌নগরে ৬৯,৭৩৭ জন লোক বসবাস

করিত। সংখ্যা দুইটা প্রায় কাছাকাছি, তবে ফরাসী নগরে কিছু বেশী। ১৯১১ সনে ঢাকার লোক সংখ্যা দাঁড়ায় এক লাখের কিছু উপর,—১,০৮,৫৫১ আর রাঁস সহরে সেই বৎসর অধিবাসীর সংখ্যা ছিল ১,১৫,১৭৮। এই সংখ্যাটার লাগালাগি সংখ্যা ঢাকায় দেখা দিয়াছে ১৯২১ সনের লোক-গণনায়। আজকাল বোধ হয় ১,২০,০০০ অথবা ১,২২,০০০ নরনারী ঢাকায় বাস করে।

ঘটনাচক্রে রাঁস সহরের লোক সংখ্যা ১৯২১ সনে মাত্র ৭৬,৬৪৬। এই অধোগতির কারণ সকলেরই জানা-কথা। কেননা ১৯১৪-১৮ সনের কুরুক্ষেত্রে রাঁসনগর ধ্বংস প্রাপ্ত হয় আর লোকজন বাস্তভিটা ছাড়িয়া পলায়ন করে। ফরাসী কাগজ-পত্রে দেখিতেছি, এক্ষণে পুনর্গঠন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। লোকজন অনেকে ফিরিয়া আসিতেছে। বহুসংখ্যক বিদেশী লোকও বাসিন্দা হইতেছে। লোক সংখ্যা ইতিমধ্যে লাখ পার হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ১৯২১ সনের সংখ্যা এখনো পৌঁছে নাই।

যাহা হউক, দেখিতেছি যে, এশিয়ার একটা শহর আর ইয়োরোপের একটা শহর,—দুইই প্রায় একই মাপে বাড়িয়া চলিতেছে। পঞ্চাশ বৎসরের ভিতর দুনিয়ার পূর্ব্বে ও পশ্চিমে নাগরিক জীবনের গতি মোটের উপর এক-মুখো। অর্থাৎ পশ্চিমকে নগর-নিষ্ঠ বা নগর-প্রধান আর পূবকে পল্লী-নিষ্ঠ বা পল্লী-প্রধানরূপে বর্ণনা করা ধনবিজ্ঞানের ধাতে অসম্ভব। লোক-বহুল জনপদ অর্থাৎ নগর ইয়োরোপের "সেকালে" ছিল না। পশ্চিমা রক্তও পল্লী-কেন্দ্রেই মস্‌গুল থাকিতে অভ্যস্ত ছিল। ১৮০৮ সনে রাঁসনগরে লোক বাস করিত মাত্র হাজার বিশেক; আজকালকার বিষ্ণুপুর বা কিশোর-গঞ্জ সেই কোঠায় রহিয়াছে।

বাঙলায় আজকাল শ দেড়েক মিউনিসিপ্যালিটি চলিতেছে। দুনিয়ার মাপে এ উল্লেখযোগ্যই নয় বটে। কিন্তু পঞ্চাশ বৎসরের ক্রমবিকাশ হিসাবে এই তথ্য নেহাৎ নিন্দনীয়ও নয়। ১৮৭২ সনের বাঙলায় সহরে লোক ছিল গুনতিতে ১৮,৫৭,৫০৪ জন। ১৯২১ সনের জরীপে দেখা যাইতেছেন ৩১,১১,৩০৪,—প্রায় পৌনে দুগুনের কাছাকাছি।

## ৪। ভারতে মজুর-নিষ্ঠা

বিগত পঞ্চাশ বৎসরের ভিতর বাঙালী জাতি যত কারণে নবশক্তির আধার হইয়া উঠিয়াছে তাহার ভিতর আধুনিক শিল্পকর্ম্মের সেবক, বীন মজুর

সম্প্রদায় অন্যতম। বাস্তবিক পক্ষে শহর, মধ্যবিত্ত শ্রেণী, ফ্যাক্টরি আর মজুর এই চার বস্তু আধুনিক আধ্যাত্মিকতার সমান প্রতিমূর্ত্তি। ভারতবর্ষ এই কর্ম্মক্ষেত্রে কোনো নতুন সৃষ্টি দাবী করিতে অসমর্থ। কিন্তু ইয়োরামেরিকার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিয়া আমরাও জাপানীদের মতনই নবীন অর্থ, সমাজ ও রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিবার পথে আসিয়া দাঁড়াইতেছি।

বর্ত্তমান জগতের অন্যান্য দেশের মতন ভারতও ক্রমশঃ ফ্যাক্টরি-নিষ্ঠ ও মজুর-নিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছে। অন্যান্য দেশের মতন ভারতেও মজুর-শক্তিই স্বরাজ ও স্বাধীনতার প্রধান সহায়রূপে দেখা দিতেছে। কাজেই মজুর-আন্দোলনের ক্রমিক উন্নতিকে আমি ভারতীয় আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় উন্নতিরই এক বড় খুঁটা সমঝিতে অভ্যস্ত।

এই বৎসর দিল্লীতে নিখিল-ভারত-মজুরকংগ্রেসের সপ্তম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়া গেল। আগামী বৎসর কলিকাতায় অধিবেশন বসিবে। অপরদিকে জেনেহ্বার আন্তর্জাতিক মজুর-সম্মেলনের সঙ্গে ভারতীয় মজুর-আন্দোলনের যোগাযোগে কায়েম হইয়াছে। উচ্চশিক্ষিত বাঙালী ও অন্যান্য ভারতবাসী এই আন্দোলনে মজুরদের সুহৃৎভাবে দাঁড়াইয়া ভাবুকতার নতুন নতুন কর্ম্মক্ষেত্র খুলিয়া ধরিতেছেন। মজুর-আন্দোলনে ক্রমশঃ নানা দল দেখা দিতে থাকিবে। তাহাতে ভারতের আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় লাভ ছাড়া লোকসান নাই।

## মজুর-ভারতের লোকবল

কোনো কোনো বৎসর গড়ে প্রায় ২,০০০,০০০ শ্রমিক, স্ত্রী ও পুরুষ, ধর্ম্মঘট করিতে শিখিয়াছে। ধর্ম্মঘটের উদ্দেশ্য ইয়োরামেরিকার শ্রমিকদের উদ্দেশ্য হইতে এক চুলও এদিক্-ওদিক্ নয়। অর্থাৎ সকলেরই আকাঙ্ক্ষা—"কম ঘণ্টা খাটিয়া বেশী পারিশ্রমিক লইব, ভাল বাসস্থান পাইব এবং কর্ম্ম-শাসন বিষয়ক অনেক সুবিধা ভোগ করিব।" তবু বলিতে বাধ্য, ভারতের শ্রমিক আন্দোলন এখনও শৈশব অবস্থা কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। এখনও তাহার আত্মজ্ঞান সম্পূর্ণ ভাবে জাগে নাই। কেন একথা বলিতেছি তাহা পরবর্ত্তী বিবরণ হইতেই বুঝা যাইবে।

বাংলার বহু কয়লার খনি ও পাটের কল, আসাম ও বাংলার অনেকগুলি চা-বাগান এবং উত্তর-পশ্চিম ও মাদ্রাজ প্রদেশের অনেকগুলি পশম-কলের

মালিকগণ বিদেশী। শুধু ইহাদের বিরুদ্ধেই ভারতের শ্রমিক-আন্দোলন সুরু হইয়াছে একথা বলিলে মিথ্যা বলা হয়। বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলগুলির মালিক ত আর বিদেশী নয়; তাহারা ত দেশেরই লোক। তাহাদিগের বিরুদ্ধেও এ আন্দোলন বন্ধ থাকে নাই। বলা বাহুল্য, শ্রমিক ও ধনিকের মধ্যে এই মন-কষাকষি প্রায়ই কোনরূপ জাতিবিদ্বেষ-প্রসূত নয়। স্বদেশানুরাগ, জাতীয়তা বা রাজনীতির গন্ধও ইহার মধ্যে এক প্রকার নাই। শুদ্ধমাত্র আর্থিক অবস্থার দরুণই এই আন্দোলনের সূত্রপাত।

অনধিক ৩০,০০০৲ টাকা মূলধন লইয়া যে সমস্ত "ছোট-খাট" শিল্প-ব্যবসা চলিতেছে, তাহাদের কথা বর্ত্তমানে না হয় বাদই দিলাম। তাহাতে বেশী লোক খাটেও না এবং সেখানে ফ্যাক্টরি চালানোর সমস্যা বা শ্রমের অবস্থা তেমন সঙ্গীনও নয়।

কিন্তু "মাঝারি" ও "বিরাট" শিল্পকারখানাগুলিতেই শ্রমসমস্যা সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে—তা সে কারখানাগুলি স্বদেশীরই হউক বা বিদেশীরই হউক। টাটার লৌহ-কারখানায় ২৫,০০০ হাজার, হুকুম চাঁদের পাটের কলে ৫,০০০ হাজার মজুর খাটে। কাপড়ের কলগুলায় গড়ে এক হাজারের উপর লোক কাজ করে। এ সমস্তই দেশীয় কারখানা।

সরকারী গোলাগুলির কারখানার প্রত্যেকটিতে গড়ে প্রায় ১,৭০০ লোক খাটে। অন্যান্য শিল্প-কারখানায় যাহারা কাজ করে, তাহাদের গড় ১০০ হইতে ১৫০ পর্য্যন্ত। এইরূপ শ্রমিকসংখ্যার গড় ( ফাক্টরি প্রতি ) বৃটিশ ভারতে ২৩০ এবং দেশীয় রাজ্যে ১৪০।

অবশ্য সব ক্ষেত্রেই সংখ্যাগুলিকে ঠিকের কাছাকাছি বলিয়া ধরিতে হইবে। যে সংখ্যা উপরে দেওয়া গেল সেটা কোনমতেই উপেক্ষণীয় নয়। জাপানে, ইতালিতে, এমন কি ফ্রান্সেও—এক একটা ফ্যাক্টরির কথা ধরিলে—অবস্থা এখানকার অবস্থা অপেক্ষা বেশী ঘোরালো নয়। শ্রমিক পুরুষ ও স্ত্রীর মোট সংখ্যা হয় ত ভারতবর্ষ অপেক্ষা সে সব জায়গায় বেশী। কিন্তু ফ্যাক্টরির শ্রম-বন্দোবস্ত-সমস্যা এবং মালিক ও ম্যানেজারদিগের উপর শ্রমিকদের প্রতিক্রিয়া ভারত ও বিদেশ সর্ব্বত্রই সমান। শিল্প-মজুরদের সমস্যা আজ আন্তর্জাতিক হিসাবে পৃথিবী ব্যাপিয়া বর্ত্তমান।

কিন্তু ভারতের সাধারণ জীবনে শ্রম এখনও একটি প্রধান শক্তিরূপে কাজ করিতেছে না। শ্রমিক-সংখ্যাই তাহা বলিয়া দিতেছে। শিল্প-মজুরের সংখ্যা

ভারতে ১৩,৭৬,১৩৬ মাত্র। এই সংখ্যাকে ভারতের অধিবাসীর সংখ্যার সহিত তুলনা করিলে বলিতে হইবে, ইহা নিতান্তই নগণ্য। রেলের লোক, জাহাজের খালাসী, খনির মজুর, চা-বাগানের কুলী, কারিগর এবং শিক্ষিত ও অশিক্ষিত শ্রমিক ইত্যাদি সকলের (স্ত্রী ও পুরুষ ধরিয়া) সংখ্যা ধরিলে দেখা যায়, ভারতের সমস্ত অধিবাসীর শতকরা প্রায় দশ ভাগ লোক এই "শ্রেণী"র অন্তর্গত। তবু এই সংখ্যাটা গ্রেটবৃটেন, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, জার্ম্মাণি ও ফ্রান্সের "সঙ্ঘবদ্ধ" শিল্প-মজুরের তুলনায় খুব সামান্যই বলিতে হইবে।

## শ্রমিক বনাম ধনিক

ভারতে শ্রমিকদের আকাঙ্ক্ষা কিরূপভাবে পূর্ণ হইতেছে, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে, তাহার উত্তরে কেহ কেহ হয় ত বলিবেন—মন্দভাবে নয়। সপ্তাহে কত ঘণ্টা খাটিতে হইবে তাহা জেনেহ্বার আন্তর্জাতিক শ্রমিক মজলিসে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ভারতের ব্যবস্থাপক সভাও তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন। গ্রেটব্রিটেন, যুক্ত-রাষ্ট্র, জার্ম্মাণি ও অন্যান্য শিল্প-প্রধান দেশে দৈনিক আট ঘণ্টা কাজ এখনও কিন্তু "আইনে" পরিণত হয় নাই। এই হিসাবে ভারতবর্ষকে আধুনিকতমই বলিতে হইবে। হয় ত একটু অকালেই তাহার এই আধুনিকতা।

কিন্তু এখনও অনেক কিছু করিবার আছে। শ্রমিকদের নেতারা একটি বিল ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করিয়াছিলেন। শ্রমিক স্ত্রীলোক-দিগকে প্রসবের পূর্ব্বে ও পরে কতকগুলি সুবিধা দেওয়ার জন্যই ঐ বিলের উত্থাপন। কিন্তু উহা এখনো পাশ হয় নাই। উহার পাশ হইবার সম্ভাবনাও খুব কম। তাহার অনেক কারণ আছে। তন্মধ্যে একটি কারণ—কলের মালিকদিগের আপত্তি। মালিকদের সমিতি গভর্ণমেণ্টকে একখানি পত্রে জানাইয়াছেন যে, ঐ বিলের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইলে গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে তাঁহারা একমত। তাঁহারা তেজের সহিত বলিয়াছেন, ঐ বিষয়ে জন-সাধারণের মত এখনও প্রবল নয়। ব্যবস্থাটা প্রবর্ত্তিত হইলে, ঐ বিষয়ে তদারক করাও কঠিন হইবে—ইত্যাদি। তাঁহাদের প্রদর্শিত কারণের মধ্যে একটি কারণ এই যে, শ্রমিকেরা বিশেষভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হয় নাই। আর

একটি কারণ এই যে, স্ত্রী-ডাক্তারের সংখ্যা পর্য্যাপ্ত নয়। সুতরাং বিলের সর্ত্তানুসারে ডাক্তারী-সাহায্য প্রদান করা শক্ত।

একপুরুষ আগে ঐ ধরণের যুক্তি ইয়োরোপেও শুনা যাইত। মনে রাখিতে হইবে যে, ভারতীয় গভর্মেণ্ট এখনও জানেন না—বাধ্যতা-মূলক সার্ব্বজনীন অবৈতনিক শিক্ষার আইন কি বস্তু! তাঁহাদের ব্যবস্থা হইতেই বেশ বুঝা যায়, আজ ভারতীয় শ্রমশক্তির দৌড় কত দুর এবং যে বিশ্ব-শ্রমের মধ্যে আজ সে আসন পাইয়াছে, তাহার পশ্চাদ্‌ভাগের কোন্ স্তরে তাহার অবস্থিতি। অবশ্য আর্থিক জগতে উন্নতি করিতে হইলে ভারতেব পন্থা আধুনিক দেশের পন্থা হইতে বিভিন্ন হইবে না।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলিয়া রাখা ভাল। শ্রম-বীমা কি বস্তু তাহা কিন্তু ভারতে এখনও অজ্ঞাত। আকস্মিক বিপদ, রোগ অথবা বার্দ্ধক্যে শ্রমিক স্ত্রীপুরুষেরা বিশেষ কিছু সাহায্য পায় না। প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন বিল আইন-রূপে পরিগণিত হইয়াছে কেবল মাত্র ১৯২৫ সনের প্রথম ভাগে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বোম্বাইয়ের কলের মালিকেরা ভারতবর্ষেরই লোক, ইয়োরোপের লোক নন। জাতীয়তা বা স্বাদেশিকতার কোনো দিক্ দিয়াই তাঁহাদের আচরণ প্রাচ্যের প্রতি প্রাচ্যের অনুরূপ নয়। অর্থাৎ তাঁহাদের ব্যবহার ইংরেজ মালিকদের ব্যবহারেরই সমতুল। কাজে-কাজেই ভারতের মজুরেরা দেশীয় ও বিদেশীয় মালিকের মধ্যে কোনো রকম ইতর বিশেষ করিতে পারে না। আজ তাই ভারতের শ্রমিক সমাজ পুঁজির বিপক্ষে, "ধন-তন্ত্রে"র বিপক্ষে দাঁড়াইতে শিখিতেছে। কোন্ জাত, কোন্ দেশের লোক, কোন্ ব্যক্তি-বিশেষ এই পুঁজির মালিক তাহার প্রতি তাহাদের ভ্রুক্ষেপ নাই।

## ভারতীয় শ্রমিক-পত্রিকা

ভারতের শ্রমিক এখন উদ্বুদ্ধ হইবার চেষ্টা করিতেছে। ইহার মধ্যেই "নিখিল ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস" দেখা দিয়াছে। তাহার শাখা-প্রশাখাও প্রদেশে প্রদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছে এবং প্রতি বর্ষে তাহার বৈঠকও বসিতেছে। ত্রিশ বৎসর আগে কেবলমাত্র একখানি শ্রমিক-পত্রিকা ছিল। বোম্বাইয়ের স্বদেশ-প্রেমিক লখনদে গুজরাটি ভাষায় তাহা প্রকাশ করেন। তাহার নাম ছিল "দীনবন্ধু"। কিন্তু আজ সেইখানে ভারতের বিভিন্ন ভাষায়

এবং ইংরেজীতে প্রকাশিত প্রায় বিশখানি পত্রিকার নাম করা যায়। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি শ্রমিকদের নিজেদের দ্বারাই পরিচালিত। অন্য সম্প্রদায়ের তাহাতে হাত নাই।

মারাঠীভাষায় "কামগর উদয়" নামে একখানি পত্রিকা আছে। বোম্বাইয়ের সেণ্ট্র্যাল লেবার বোর্ড-কর্ত্তৃক তাহা প্রকাশিত। মারাঠী সাপ্তাহিক "কামকরী" ও বোম্বাই হইতে প্রকাশিত হয়। আহাম্মদাবাদে গুজরাটীভাষায় "মজুর-সন্দেশ" নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা আছে। কানপুর হইতে হিন্দীতে "মজদুর" পত্রিকা সপ্তাহে দুইবার করিয়া বাহির হয়। কলিকাতায় 'শ্রমিক' নামে একখানি সাপ্তাহিক আছে। তাহার দুইটী করিয়া সংস্করণ বাহির হয়, একটী বাংলাতে, আর একটী হিন্দীতে। কলিকাতার সাপ্তাহিক "লাঙল" উঠিয়া গিয়াছে। এখন দেখা দিয়াছে "গণ-বাণী"।

রেলওয়ে কর্ম্মচারীদের স্বার্থের কথা প্রকাশ করিবার জন্য অনেকগুলি পত্রিকা ইংরেজীতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের ইণ্ডিয়ান লেবার ইউনিয়ন-কর্ত্তৃক "ইণ্ডিয়ান লেবার জার্ণ্যাল" নামে একখানি মাসিক পত্রিকা সাঁতরাগাছি হইতে বাহির করা হয়। বোম্বাই হইতে গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার রেলওয়ে ইউনিয়ন কর্ত্তৃক "জি, আই, পি, হ্যারল্ড" নামে একখানি পত্রিকা মাসে দুইবার করিয়া বাহির করা হইয়া থাকে। নর্থ-ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে ইউনিয়ন-কর্ত্তৃক একখানি সাপ্তাহিক লাহোর হইতে প্রকাশিত হয়। আউদ-রোহিলাখণ্ড রেলওয়ে ইউনিয়ন-কর্ত্তৃক 'মজদুর' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশিত হয়। সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে ইউনিয়নের 'দি রেলওয়ে গার্জ্জিয়ান' একখানি সরকারী পত্রিকা। নাগপত্তন (মাদ্রাজ) হইতে উহা প্রকাশিত। তারপর 'রেলওয়ে টাইমস' নামে একখানি সাপ্তাহিক আছে। ভারতবর্ষের ও ব্রহ্মদেশের যাবতীয় রেল-কর্ম্মচারীদের যা-কিছু সমস্যা, সে সমস্তই ইহাতে স্থান পায়। ঐ সব কর্ম্ম-চারীদের মিলনসঙ্ঘ-কর্ত্তৃক মুখপত্ররূপে ইহা বোম্বাই হইতে বাহির করা হয়।

ডাক-বিভাগের কর্ম্মচারীদেরও অনেকগুলি পত্রিকা আছে। বাংলা এবং আসামের পোষ্ট্যাল ও রেলওয়ে মেল সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন কর্ত্তৃক 'লেবার' নামে একখানি মাসিক-পত্রিকা কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। আর এক খানির নাম 'পোষ্টম্যান'। ইহা বোম্বাই প্রদেশের 'পিয়ন ইউনিয়নে'র মুখপত্র। উক্ত পত্রিকাদ্বয়ই ইংরেজীতে লেখা হয়। বোম্বাই প্রদেশের পোষ্ট্যাল ও

রেলওয়ে মেল সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন-কর্তৃক 'জেনারেল লেটার্স' নামে একখানি মাসিক বোম্বাই হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই নামের আর একখানি মাসিক পত্রিকা পুনার পোষ্ট্যাল ও রেলওয়ে মেল সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন-কর্তৃক প্রকাশিত হয়। লাহোর হইতে পাঞ্জাব এবং নর্থ-ওয়েষ্টার্ণ পোষ্ট্যাল ও রেলওয়ে মেল সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন 'পাঞ্জাব কমরেড্' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়া থাকেন। কলিকাতা হইতে 'জেনারেল লেটার্স' নামে আর একখানি মাসিক নিখিল ভারতীয় ( ব্রহ্মদেশ ধরিয়া ) পোষ্ট্যাল ও রেলওয়ে মেল সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন-কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

ইংরেজীতে দুইখানি শ্রমিক-পত্রিকা উল্লেখযোগ্য। একখানি বোম্বাই হইতে প্রকাশিত। নাম 'সোশ্যালিষ্ট'। ইহা সাপ্তাহিক। আর একখানি মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত। নাম 'স্বধর্ম্ম'। ইহাও সাপ্তাহিক।

বোম্বাই গভর্মেণ্টের 'লেবার বিউরো' মাসে মাসে একখানি বুলেটিন প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাহাতে দেশী-বিদেশী সকল প্রকার তথ্যই থাকে।

## ৫। নারীত্ব ও বর্ত্তমান জগৎ

আদর্শ এবং জীবনের লক্ষ্য হিসাবে ভারতীয় নারীতে আর পাশ্চাত্য নারীতে কোনো প্রভেদ নাই। আইনের চোখে, আর্থিক তরফ হইতে এবং রাষ্ট্রীয় মাপকাঠিতে ইয়োরামেরিকার মেয়েরা এসিয়ার মেয়েদের মতনই 'গোলাম' ছিল। মাত্র ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর ধরিয়া নারী-স্বাধীনতার আন্দোলন পশ্চিমা জগতে চলিতেছে। অর্থাৎ পুরুষের সঙ্গে মেয়ের সাম্য কায়েম করিবার চেষ্টা পশ্চিম মুল্লুকে বেশী পুরানো চিজ নয়।

এই দিকে পশ্চিমা মেয়েরা কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছেও। কিন্তু যুগের পর যুগ ধরিয়া ভারতের নারী আর খ্রীষ্টিয়ান পশ্চিমা নারী প্রায় এক গোত্রের জীবই ছিল। গোটা জগৎ একই পথে, একই মতে, একই আদর্শে চলিয়াছে। ভারতের নারী খ্রীষ্টিয়ান নারী অপেক্ষা উন্নত ছিল না। আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া ইয়োরামেরিকার নারী মানব-সভ্যতার নতুন এক অধ্যায় খুলিয়া দিতে সুরু করিয়াছে। এই পথ তাহাদের আবিষ্কৃত চিজ। ভারতীয় নারীও সেই পথেই চলিতেছে এবং চলিবে। পূর্ব্বে পশ্চিমে এখন টক্কর চলিতেছে ঠিক যেন ঘোড়দৌড়,—পশ্চিমারা আগে আগে ছুটিতেছে, কিন্তু উহাদের কানটা

মাত্র সম্প্রতি আগে আছে। ভারতীয় নারীকে বর্ত্তমান জগৎমাফিক কর্ম্ম-দক্ষতা, জীবনবত্তা ও ভাবুকতা অর্জ্জন করিবার জন্য এখনও কিছুকাল পশ্চিমা মেয়েদের পেছন পেছনই ছুটিতে হইবে। ইহাই যুবক বঙ্গের—যুবক ভারতের—যুবক এসিয়ার নারী-সমস্যা।

সমগ্র বিশ্ব ও সমস্ত জাতি সেই পুরাকাল হইতে এক পথে চলিতেছে। পাশ্চাত্যের কর্ম্মপদ্ধতি এক প্রকার আর প্রাচ্যের অন্য প্রকার একথা ঠিক নয়। সুয়েজ খালের এক পারের লোকদের যে পথ,—অপর পারের লোকদেরও সেই একই পথ। প্রাচ্যদেশ যে আধ্যাত্মিক হিসাবে জগতের গুরুস্থানীয় এ কথাও সত্য নয়। প্রাচ্যদেশ কোনো অতীতকালে জগতের গুরু ছিল, তাহাও ঠিক বলা চলে না। বড় জোর প্রাচ্যেরা পাশ্চাত্যের সমকক্ষ হইয়া চলিয়াছিল এই পর্য্যন্ত। সকলে এক দিকে চলিয়াছে। তবে কেহ বা আগে, কেহ বা পশ্চাতে। কেহ বা দশম ধাপে, কেহ বা অষ্টম ধাপে, কেহ বা তৃতীয় ধাপে, আবার কেহ কেহ প্রথম ধাপেও রহিয়াছে।

ইয়োরোপে "ভদ্র-ঘরের" মেয়েরা কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত আফিসে বা ব্যাঙ্কে চাকুরি কিরত না। আজকাল করিতেছে। ভারতে আজও মেয়ে-মহলে এইরূপ চাকুরির বিরুদ্ধে বিদ্বেষ আছে। কিন্তু বিদ্বেষ ক্রমে ক্রমে কমিতেছে। আর মধ্যবিত্ত ছাড়া নিম্ন শ্রেণীর মেয়েরা ত চিরকালই সকল দেশে গতর খাটাইয়া খাইতে অভ্যস্ত।

## ৬। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য ও স্বদেশী আন্দোলন

আর্থিক দুনিয়ায় একঘরো হইয়া জীবন কাটানো অসম্ভব। জগতের নানা লোকের সঙ্গে মালের আদান-প্রদান অবশ্যম্ভাবী। ঘরের দুয়ার বন্ধ করিয়া মানবজাতিকে "কলা দেখানো" কখনই চলিতে পারে না।

বিদেশে কিছু কিছু মাল প্রত্যেক দেশকে কিনিতেই হইবে। তাহা না হইলে স্বদেশের শিল্প-বাণিজ্য অচল থাকিতে বাধ্য। অপর দিকে বিদেশে প্রত্যেক দেশেরই কিছু না কিছু মাল বেচিতেও হইবে। তাহা না হইলে বিদেশী জিনিষের দাম সমঝাইয়া দেওয়া যাইবে কোথা হইতে? এই সকল গোড়ার কথা ধামা চাপা দিয়া রাখিলে "স্বদেশী আন্দোলন" সম্বন্ধে সুব্যবস্থা করা অসম্ভব।

সকল ক্ষেত্রেই অঙ্ক কষিয়া দেখা আবশ্যক এক একটা জিনিষ তৈয়ারী করিয়া বাজারে ফেলিতে খরচ পড়িতেছে কত। যদি দেখা যায় যে বিদেশী মাল সস্তায় পাওয়া যাইতেছে তাহা হইলে এই দুই দরের প্রভেদটাকে শুল্কের দ্বারা যথাসম্ভব কমাইবার চেষ্টা করা চলিতে পারে। কিন্তু তাহা বলিয়া যে ব্যবসাটার বাঁচিবার কোনো সম্ভাবনা নাই তাহার জন্য বিদেশী মালের উপর মোটা হারে শুল্ক বসানো অসঙ্গত। আবার যখন-তখন যে-সে স্বদেশী কারবারকে শিশু-কারবার বলিয়া তাহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জলের মত টাকা ঢালাও আহাম্মুকি।

লড়াইয়ের পর আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য-জগতে একটা কাণ্ড বিশেষরূপে দেখা দিয়াছে। কারখানাওয়ালাদিগকে তাহাদের দেশের বাজার হইতে সমূলে উৎপাটন করিবার মতলবে বিদেশী কারখানাওয়ালারা নানা কৌশল অবলম্বন করিতেছে। এই সকল কৌশলের ভিতর গবর্ণমেণ্টের সাহায্য অন্যতম। তাহার ফলে বিদেশের বাজারে অতি সস্তায় মাল হাজির করা হইয়া থাকে।

বিশেষতঃ যদি কোনো দেশে ঘটনাক্রমে মজুরির হার অন্য দেশের তুলনায় নীচু থাকে তাহা হইলে যে-দেশে মজুরির হার অপেক্ষাকৃত উঁচু সেই দেশের কারখানাওয়ালারা নিজ মুল্লুকেই বিদেশী মালের সঙ্গে টক্কর দিতে অসমর্থ হয়। যে সকল দেশে "ইন্‌ফ্লেশ্যন" বা কাগজী-মুদ্রার অতি-বিস্তারের দরুণ মুদ্রা-পতন ঘটিয়াছে সেই সকল দেশের মাল অন্যান্য দেশে পৌঁছিলে তাহাদের পক্ষে আত্মরক্ষা করা অসম্ভব। শুল্ক-দুনিয়ার পারিভাষিকে তাহার নাম "ডাম্পিং"। ডাম্পিং-বিরোধী শুল্ক এক্ষণে দুনিয়ার সর্ব্বত্রই চলিতেছে। তবে ইহাকে মামুলি সংরক্ষণ-শুল্ক হইতে স্বতন্ত্র বিবেচনা করা ধনবিজ্ঞানের ন্যায়-শাস্ত্রের পক্ষে সুকঠিন।

## ভারতের জাপানী-সমস্যা

দুনিয়ার সর্ব্বত্রই সংরক্ষণ-নীতির দিগ্‌বিজয় চলিতেছে। এখন প্রশ্ন কেবল খরচ-পত্রের আঁকজোক আর আমদানি-রপ্তানির সূচী-সংখ্যা। এই উপলক্ষ্যে ভারত সম্বন্ধে জাপানী জটিলতার কিঞ্চিৎ বিশ্লেষণ করিতেছি।

জাপান ভারতবাসীর পক্ষে মাল বেচিবার এক বড় বাজার। জাপানীরা আমাদের মাল কিনে ৮৫ ক্রোর টাকার। আর আমরা ভারতে মাত্র

২৬ ক্রোর টাকার জাপানী মাল খরিদ করিয়া থাকি। জাপানী মালের খরিদ্দার হিসাবে ইয়াঙ্কিস্থান আমাদের ভারতের চারগুণ বড়।

জাপানের সঙ্গে বোম্বাইওয়ালারা খোলাখুলি আড়ি চাহিয়া থাকেন। কিন্তু সত্যসত্যই আড়ি চালাইলে ভারতবাসীর লোকসান কতটা এই অঙ্কে ধরা পড়িয়া যাইতেছে। জাপানীরা ভারতীয় মাল বয়কট করা সুরু করিলে লোকসান আমাদের নেহাৎ কম নয়। আর আমরা যদি গায়ে পড়িয়া জাপানীদের সঙ্গে দুস্‌মনি চাগাইয়া তুলি তাহা হইলে আমরা নিজ বাজারটা নিজেই খোয়াইয়া বসিব।

জাপানে আর বোম্বাইয়ে বাণিজ্য-লড়াইটা এক বিচিত্র আকারে দেখা দিতে পারে। জাপানীদের সঙ্গে ভারতবাসীর যে আমদানি-রপ্তানি চলিয়া আসিতেছে তাহার পশ্চাতে আছে একটা "কন্‌ভেনশ্যন" বা বাণিজ্য-সমঝোতা। ১৯০৫ সনে এই বিষয় লইয়া জাপানে আর বৃটিশ গভর্ণমেণ্টে সন্ধি-জাতীয় বন্দোবস্ত কায়েম হয়। বোম্বাইওয়ালারা এইটা রদ করাইবার আন্দোলন চালাইতেও পশ্চাৎপদ নয়।

তাহার পাণ্টা জবাব দিয়া জাপানী ব্যবসায়ীরা বলিতেছে,—"বহুত আচ্ছা। আমরা ভারতীয় লোহার বিরুদ্ধে আন্দোলন রুজু করিতেছি।" জাপানে ভারতীয় লোহার উপর কড়া শুল্ক বসিলে ভারতীয় লোহাওয়ালাদের ক্ষতি বিস্তর। কাজেই লড়াইটা চলিতেছে,—কাপড় বনাম লোহা। অতএব স্বদেশী আন্দোলনের ব্যাখ্যায় ভাঙন-গড়ন অবশ্যম্ভাবী।

### ইস্পাত ও সংরক্ষণ-শুল্ক

সংরক্ষণ-নীতি চালাইলেই যে দেশের উপকার হয় তাহা বিনা বাক্যব্যয়ে স্বীকার করিয়া লওয়া চলে না। আমাদের চোখের সম্মুখে দুইটা বড় দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

টাটার লোহা আর ইস্পাত কারখানার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলেই অনেকের চোখ ফুটিবার কথা। সরকারী ধনভাণ্ডার অর্থাৎ ভারতীয় নরনারীর দেওয়া ট্যাক্‌স হইতে সাহায্য না পাইলে টাটা কোম্পানী একদম অচল। কতবার ৬০ লাখ টাকা করিয়া দিতে হইবে তাহার কোনো স্থিরতা নাই। এদিকে টাটা কতদিন বাঁচিবে তাহাও বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিতে যাচাই করা হয় নাই।

সংরক্ষণ-নীতির ফলে ভারতের নরনারীকে নানা তরফ হইতে অর্থকষ্ট সহিতে হইতেছে। কোনো একটা নির্দ্দিষ্ট শিল্প বা ব্যবসাকে নিজ পায়ের

উপর দাঁড় করাইবার জন্য এরূপ স্বার্থত্যাগ ট্যাক্‌স্‌-দাতাদের পক্ষে কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয় ত অনুচিত নয়। কিন্তু সংরক্ষণ-নীতির অপর দিকটাও ভারতীয় স্বদেশসেবকগণের মগজে বসা দরকার। যে-যে শিল্পকে বা ব্যবসাকে বাঁচাইবার জন্য ভারত-সন্তান নিজের রক্ত দিতে বাধ্য হইতেছে সেই সকল শিল্প ও ব্যবসার কর্ম্ম-পরিচালনায় তাহাদের মতামত এবং স্বার্থ রক্ষিত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। স্বরাজ-নীতিকে বাদ দিলে সংরক্ষণ-নীতির আধখানাই মাঠে মারা যাইবে। টাটার উপর কঠোর নজর রাখা প্রত্যেক বিচক্ষণ স্বরাজ-সেবকের অবশ্য কর্ত্তব্য।

এই বৎসর পক্ষপাতমূলক ইস্পাত-সংরক্ষণ আইন জারি হইয়াছে। বিদেশী ইস্পাতের আওতা হইতে স্বদেশী ইস্পাতের বাজারকে রক্ষা করা এই আইনের মতলব।

কিন্তু "বিদেশী"কে ভাগ করা হইয়াছে দুই খণ্ডে, (১) বিলাতী, (২) অন্যান্য বিদেশী, যথা মার্কিণ, ফরাসী, বেলজিয়ান, জার্ম্মাণ ইত্যাদি। বিলাতী ইস্পাতের উপর যে হারে শুল্ক বসানো হইল "অন্যান্য বিদেশীর" উপর তাহার চেয়ে বেশী হার চাপানো হইয়াছে।

আসল কথা,—এই ক্ষেত্রে বিলাতী ইস্পাতকে ভারতের বাজারে বাঁচানো হইল "অন্যান্য বিদেশী" ইস্পাতের আক্রমণ হইতে। "অন্যান্য বিদেশী" ইস্পাতের সঙ্গে স্বাধীন ভাবে টক্কর চালাইয়া বিলাতী ইস্পাত ভারতের বাজারে আত্ম-রক্ষা করিতে অসমর্থ।

বিলাতী ইস্পাতের স্বপক্ষে এইরূপ হামদর্দ্দি দেখানো ভারতীয় ক্রেতা ও জনসাধারণের পক্ষে আর্থিক হিসাবে ক্ষতিকর। ভারতবাসী আজকাল অনর্থক অত্যধিক মূল্যে বিদেশী ইস্পাত কিনিতে বাধ্য হইতেছে। তাহাতে বিলাতের ইস্পাত-ব্যবসায়ীদের লাভ আছে যথেষ্ট, কিন্তু ভারতীয় নরনারীর লাভ আধ কাঁচ্চাও নাই। বরং আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি ইত্যাদি বড় বড় দেশের অপ্রীতি অর্জ্জন করা হইতেছে মাত্র। তাহাতে রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক দুই প্রকার ক্ষতিই ভারতের কপালে জুটিয়াছে।

## ৭। রেল বিস্তারে আর্থিক উন্নতি

বর্ত্তমানে ভারতীয় রেলপথগুলা একত্রে লম্বায় ৩৮,৫৭৯ মাইল। এই সব তৈয়ারি করিতে মাইল প্রতি গড়ে প্রায় ২,০০,০০০ টাকা লাগিয়াছে। কী

বৎসর মোটের উপর ৬০ কোটি লোক রেলপথে যাতায়াত করে আর মাল চলাচলের পরিমাণ ৮ কোটি টন। অর্থাৎ ভারতের লোকসংখ্যা সংক্ষেপে ৩০ কোটি ধরিয়া লইলে প্রত্যেক ভারতবাসী বৎসরে অন্ততঃ দুইবার করিয়া রেলে মোসাফিরি করে। আর ফী মোসাফির গড়-পড়তা প্রায় সিকি টন (৭ মণ) মাল লইয়া চলাফেরা করিতে অভ্যস্ত।

আজ হইতে ১৯৩২ পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরের ভিতর ১৫৯টা নতুন পথ তৈয়ারি করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। তাহাতে ৯০০০ মাইলের মোসাবিদা আছে। ১৯৩২ সনের শেষের দিকে ৬০০০ মাইল নতুন রেলপথ খোলা হইয়া যাইবে। আর তখন প্রায় ৩০০০ মাইলে কাজ চলিতে থাকিবে।

রেলপথের বিস্তারে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি ঘটিয়াছে আর ভবিষ্যতেও ঘটিবে। কিন্তু আর একটা কথা মনে রাখা আবশ্যক। বহুসংখ্যক লোকের স্থায়ী অন্নসংস্থানও রেলপথের এক মস্ত কথা। আজকালকার ৩৮,৫৭৯ মাইলে ৭,৫০,০০০ লোকের ভাতকাপড় জুটিতেছে। এই সাড়ে সাত লাখের ভিতর মোটা মাহিয়ানাওয়ালা বিদেশী বা দো-আঁস্‌লাদিগকে বাদ দিলে সকলেই খাঁটি ভারত-সন্তান।

কাজেই ১৯৩২ সনের ভিতর যদি ৬,০০০ মাইল নতুন পথ খোলা হইয়া যায় তাহা হইলে আরও অনেক কুলী-কেরাণী-এঞ্জিনিয়ারের অন্নসংস্থান ঘটিতে পারিবে। একথা সহজেই বিশ্বাস করা চলে।

এইখানে আর একটা কথা মনে রাখা দরকার। দেখা গিয়াছে যে, ফী মাইল রেলপথের জন্য গড়ে প্রায় দুই লাখ টাকা পড়ে। এই দুই লাখ টাকা খরচ হয় কিসে? একটা বড় হিস্সা যায় লোহা-লক্কড়, যন্ত্র-পাতি ইত্যাদি মালে। তাহার অধিকাংশই বিদেশ হইতে আসে। কাজেই এই খরচের অধিকাংশ বিদেশীর ভোগে যায়। তাহা ছাড়া আর সবই খরচ হয় লোকের মেহনতের মজুরি বাবদ। মাথার মেহনতের উঁচু দিকটা অধিকাংশ বিদেশীদের কপালে লেখা। অবশিষ্ট ভারত-সন্তানের। হাতপায়ের মজুরি সবই অবশ্য ভারতবাসীর একচেটিয়া। অতএব মাইল প্রতি দুই লাখ টাকার অনেক-কিছুই শেষ পর্য্যন্ত ভারতীয় নরনারীর অন্ন জোগাইয়া থাকে। নানা দিক হইতেই রেল আমাদের আর্থিক উন্নতির এক বড় খুঁটা।

ম্যালেরিয়ার অন্যতম সহায়ক হিসাবে রেলপথগুলা নিন্দনীয় বটে। ইতালিতেও রেলপথের জন্য নরনারী আর জীবজন্তুকে ম্যালেরিয়ায় ভুগিতে

হইয়াছে। কিন্তু ক্রমশঃ ইতালির রেল-এঞ্জিনিয়ারেরা পুরাণো দোষ শুধরাইয়া লইয়াছে। ভারতেও এঞ্জিনিয়ারদিগের তরফ হইতে রেলনীতির সংস্কার সাধিত হইতে পারে।

## নবীন ধনবিজ্ঞানের নমুনা

আজকালকার দুনিয়ায় ধনবিজ্ঞানশাস্ত্রে ভাঙন-গড়ন চলিতেছে খুব জোরের সহিত। একটা নবীন ধন-বিজ্ঞানের সূত্রপাত হইতেছে। যুবক বাঙলার অর্থশাস্ত্রীদিগের সঙ্গে তাহার কিছু মোলাকাৎ হওয়া আবশ্যক। এক এক শ্লোকে বিপুল মহাভারতের কোনো কোনো পর্ব্ব আওড়াইয়া যাইতেছি।

### ১। সঙ্কট, চক্র ও কর্জ্জ-নীতি

ইয়োরামেরিকার পণ্ডিতেরা বিশেষ ভাবে আলোচনা করিতেছেন "ক্রাইসিস" বাণিজ্য-সঙ্কট, শিল্প-সঙ্কট বা আর্থিক দুর্য্যোগ-তত্ত্ব। কাল-বৈশাখী বা ধূমকেতুর মতন কয়েক বৎসর পর পর সংসারে এই দুর্য্যোগ দেখা দিয়া থাকে। এই আর্থিক ধূমকেতুর আকার-প্রকার বিশ্লেষণ করা, আর সম্ভব হইলে সেটাকে পাকড়াও করিয়া ঘাড় মটকাইয়া দেওয়া হইতেছে নবীন ধন-বিজ্ঞানের এক বড় সমস্যা।

মূল্য-তত্ত্বের আলোচনাও এই দুর্য্যোগ-তত্ত্বের আনুষঙ্গিক হইয়া পড়িয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে ধনোৎপাদন, ধন-বিতরণ, মজুরির হার, বাজারের দর,— সব-কিছুই আর্থিক কালবৈশাখীর আকার-প্রকার বিশ্লেষণের এপীঠ-ওপীঠ বিশেষ দাঁড়াইয়া যাইতেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রানীতি, নোট ছাড়িবার কৌশল, ব্যাঙ্কের ডিস্কাউন্ট-প্রণালী এই সব কথাও দুর্য্যোগ-তত্ত্বের বড় কথা। কারেন্সী আর ব্যাঙ্কিং স্বাধীনভাবেও বর্ত্তমানে খুব বেশী আলোচিত হইতেছে সন্দেহ নাই। কিন্তু ক্রাইসিস-তত্ত্বের সঙ্গে এই টাকা-কড়ি-তত্ত্বের যোগাযোগ আজকাল বিশেষ করিয়া বিশ্লেষণ করা হইয়া থাকে।

বাণিজ্য-সঙ্কট দেখা দেয় "সাইক্‌ল্" বা চক্রের আকারে। আর্থিক চক্রের প্রথম অবস্থায় দেদার মজা,—যাহাকে বলে "বুম্"। তাহার পর ভজকট, শেষ পর্য্যন্ত অবসান বা "ডিপ্রেশন"। বেকার-সমস্যা আর পুঁজির অপব্যয় এই সবের আনুষঙ্গিক। আবার ধীরে ধীরে স্থিতি-সাম্যে পুনর্গমন। আর্থিক উঠা-নামার ধারা হইল এইরূপ।

ক্রাইসিস-বিষয়ক দার্শনিক তত্ত্বকে নবীন ধনবিজ্ঞানের মেরুদণ্ড বলিতে পারি। এই তত্ত্বের বিশ্লেষণ করিবার জন্য আমেরিকায় আর জার্ম্মাণিতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পরিষৎ কায়েম হইয়াছে।

আলোচনার একটা নমুনা দেখাইতেছি। বাজারদরের ওঠা-নামাই হইতেছে সকল দোষের গোড়া। এইটাকে কাবু করিতে পারিলেই আর্থিক সমতা সাধিত হইতে পারে। কিন্তু তাহা করা যায় কি করিয়া? তাহার জন্য চাই বাণিজ্যের ওলট-পালট বা অতি-দ্রুত পরিবর্ত্তন (ফ্লাক্‌চুয়েশ্যান) বন্ধ করা। বাণিজ্য-বস্তুটা অর্থাৎ লেন-দেন, কেনা-বেচা, আমদানি-রপ্তানি নির্ভর করে ব্যাঙ্কের উপর। কেননা ব্যাঙ্কগুলা কারবারকে যেরূপ কর্জ্জ দেয় তাহার উপরই অনেকটা নির্ভর করে মাল কেনা-বেচার আকার-প্রকার। ব্যাঙ্ক যদি বেপারীকে অতি সহজে মালের রসিদ দেখিবামাত্র টাকা ছাড়িতে প্রস্তুত থাকে তাহা হইলে বেপারীরা আহ্লাদে আটখানা হইয়া পড়ে। আর তাহারা একেবারে দিকবিদিক-জ্ঞানশূন্য হইয়া বাজারে মাল চালাইতে লাগিয়া যায়।

এখন দেখা যাউক, ব্যাঙ্কগুলা সহজে টাকা ছাড়িতে রাজি হয় কেন? তাহাদের তহবিলে কাঁচা টাকা অনেক মজুত হয় বলিয়া। কিন্তু কাঁচা টাকা মজুতই বা হয় কেন? দেশের গবর্ণমেণ্ট অথবা নোট-ব্যাঙ্ক যদি অনেক পরিমাণ সোনার মালিক হইয়া পড়ে, আর সোনা পাইবা মাত্র তাহার সমান দামের নোট ছাড়িতে সুরু করে তাহা হইলে ব্যাঙ্কগুলাও টাকার সমুদ্রে সাঁতার কাটিতে থাকিবে।

অতএব প্রধান সমস্যা হইতেছে ব্যাঙ্কগুলাকে টাকার সমুদ্রে সাঁতার কাটিতে না দেওয়া। অর্থাৎ বেপারীদিগকে কর্জ্জ দিবার ক্ষমতা ব্যাঙ্কগুলার হাতে কম থাকিলেই অথবা উচিত পরিমাণের মাত্রা ছাড়াইয়া না গেলেই আপদঃ শান্তিঃ। তাহা হইলে কর্জ্জ-নীতিকে শাসন ও সংযত করা দাঁড়াইতেছে বর্ত্তমান দুনিয়ার আসল রাষ্ট্র-নীতি ও অর্থ-শাস্ত্র।

## ২। নয়া বিলাতে জমিদারি

এক গ্রন্থে অরুইন ও পীল নামক দুইজন ইংরেজ লেখক বলিতেছেন,— মান্ধাতার আমলের জমিদারি-প্রথা বিলাতে এখনো চলিতেছে। তাহা উঠাইয়া দেওয়া দরকার। প্রজা, রাইয়ত ইত্যাদি নামের লোক ইংরেজ

সমাজে আর থাকিবে না। প্রত্যেক চাষীই নিজ নিজ জমির মালিক হইবে। আর এই ব্যবস্থায় "স্বত্বের যাদুতে বালু হইবে সোনায় পরিণত"। লেখকদের একজনও বোল্‌শেভিক-পন্থী নন। কৃষিবিজ্ঞানে সুদক্ষ বলিয়া তাঁহাদের খ্যাতি আছে।

১৯২৩ সনে "লিবার‍্যাল" দলের রাষ্ট্রনায়কেরা একটা কমিটি কায়েম করিয়াছিলেন। ইংল্যাণ্ডের ভূমি-সমস্যা আলোচনা করিয়া কমিটি মন্তব্য প্রচার করিয়াছে।

কমিটির মতে চাষ-আবাদের প্রায় সকল বিভাগেই ইংরেজ সমাজে অসম্পূর্ণতা রহিয়াছে। জমিদারি প্রথা উঠাইয়া না দিলে বিলাতে কৃষি-সংস্কার অসম্ভব। গবর্মেণ্টের হাতে সকল আবাদী জমির দখল আসুক। যে সকল চাষীরা জমি চাষ করিতে প্রস্তুত এবং সমর্থ, বাছিয়া বাছিয়া তাহাদিগকে জমি ভাড়া দেওয়া উচিত। জমিদারদের জমি কিনিয়া লইয়া গবর্মেণ্ট তাহাদের ক্ষতিপূরণ করিবার দায়িত্ব লইতে বাধ্য। কিন্তু যে সব কিষাণ বা জমিদার নিজ হাতে অথবা মজুর খাটাইয়া জমি চষিতে অভ্যস্ত তাহাদের জমি কাড়িয়া লইবার প্রয়োজন নাই।

এই ভূমি-সংস্কারের ব্যবস্থায় ছোট ছোট বহুসংখ্যক চাষী সৃষ্ট হইবার কথা। তাহাদের হাতে হয়ত অনেক সময়েই প্রচুর পুঁজি না থাকিতেও পারে। কিন্তু পুঁজি দিয়া তাহাদিগকে সাহায্য করা গবর্মেণ্টের একটা বড় কর্ত্তব্য থাকিবে। এই জন্য ভূমি-বিষয়ক কর্জ্জ-ব্যবস্থা নূতন সরকারী আইনের অন্যতম অঙ্গ হইবে।

বিলাতে আজকাল যে আদর্শে জমিজমার আইন-কানুন গড়িয়া তুলিবার আন্দোলন চলিতেছে তাহার গোড়া ঢুঁড়িতে হইবে জার্ম্মানির আইন-কানুনের ভিতর। বার্লিনের অধ্যাপক জেরিং এই আদর্শের অন্যতম জন্মদাতা।

মনে রাখিতে হইবে যে, লিবার‍্যাল দলের মাথায় আছেন লয়েড জর্জ আর লর্ড অ্যাস্‌কুইথ। তাঁহারা এবং তাঁহাদের পেটোআরা এমন কি মজুরপন্থীও নন আর বোলশেভিক ত ননই।

## ৩। বিশ্ব-বাণিজ্যের বিজ্ঞান-বস্তু

মাল আমদানি-রপ্তানির কারবারে করিৎকর্ম্মা বেপারীদের কর্ম্মকাণ্ডই আমাদের একমাত্র দ্রষ্টব্য বস্তু নয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দুনিয়ায় দার্শনিক

বা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান-কাণ্ডের ঠাঁইও খুব বড়। কর্ম্মদক্ষ ব্যবসায়ী হইতে হইলে এই "তত্ত্বাংশ", "বিজ্ঞান-বস্তু" বা "থিয়োরি"র তরফটাও বুঝিয়া দেখা দরকার। এই বিষয়ে এক উঁচু দরের বই সম্প্রতি ইতালিয়ান ভাষায় বাহির হইয়াছে। লেখক জেনোআ সহরের ব্যবসায়-কলেজে এবং মিলানো সহরের ব্যবসায়-বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিয়া থাকেন। নাম আন্তিলিও কাব্যাত্তি।

আজকালকার দিনে প্রত্যেক দেশের বহির্ব্বাণিজ্যে প্রচুর পরিমাণে জটিলতা দেখা দিয়াছে। আমদানি-রপ্তানির তালিকা দেখিয়াই দুনিয়ার মালের চলাচল সম্বন্ধে যথাযথ ধারণা করা যায় না। যে দেশে রপ্তানি হইতেছে ঠিক সেই দেশই হয় ত মালটার আসল ক্রেতা নয়। ঐই মালই আবার অন্য কোন দেশে রপ্তানি হইতে পারে। অপর দিকে প্রত্যেক দেশেই আমদানি-রপ্তানির যন্ত্রে যথেষ্ট পাক-চক্র দেখা যায়। মাল অনেক সময়ে ব্যাঙ্কের জিম্মায় থাকে। বীমাকোম্পানীর হাত, যাতায়াত অর্থাৎ রেল জাহাজ সংক্রান্ত কোম্পানীর হাত এবং মালগুদামওয়ালা কোম্পানী ইত্যাদি নানাবিধ ব্যবসায়-সঙ্ঘের মধ্যস্থতার ফলে মালের গতিবিধি স্পষ্টরূপে ঠাওরাইয়া উঠা কঠিন হয়। বাস্তবিক পক্ষে কোন্ ব্যক্তি বা কোম্পানী ক্রেতা এবং কেই বা যে বিক্রেতা এই সামান্য বিষয়েই পরিষ্কার ধারণা জন্মে না।

তাহার উপর গোলযোগ উপস্থিত হয় মালের দাম দিবার প্রণালীতে। কাগজে-কলমে দামটা অবশ্য টাকাপয়সায়ই বুঝাইয়া দিবার দস্তুর আছে। কিন্তু কোনো দেশ হইতে অপর কোনো দেশে নগদ মুদ্রার চলাচল হয় যার পর নাই কম। সংসারে দেখিতে পাই কেবল মালেরই গতিবিধি। এক দেশের টাকা অন্যদেশে রপ্তানি হয় না বলিলেই ঠিক হয়। চলে কেবল "চেক" বা "কাগজ" আর মাল।

কাজেই বিশ্ববাণিজ্যের জটিলতা যার পর নাই বাড়িয়া গিয়াছে বলিতে হইবে। এই জটিল পাকচক্রের ভিতরও কোনো সূত্র ঢুঁড়িয়া পাওয়া সম্ভব কি? সেই সূত্রগুলা আবিষ্কার করাই বিজ্ঞান বা দর্শনের কাজ।

প্রথম সূত্র এই যে, কোনো মাল যখন বিদেশে বেচা হয় তখন তাহার পরিবর্ত্তে বিদেশ হইতে পাওয়া যায় অন্য কোনো মাল। বিদেশে যদি স্বদেশী মাল বেচিতে চাও, ত কোনো না কোনো বিদেশী মাল কিনিতে

হইবেই হইবে। মালে মালে বিনিময়ই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গোড়ার কথা। এক মালের দাম হইতেছে অপর এক মাল। মালে মালে কাটাকাটি হইয়া গেলেই আমদানি-রপ্তানির মামলা চুকিয়া যায়।

অতএব বিজ্ঞানের আসল সমস্যা হইতেছে কোন্ মালের পরিবর্ত্তে কোন্ মাল পাওয়া যায় তাহা অঙ্ক কষিয়া বাহির করা। অন্তর্বাণিজ্যের বেলায় মালে মালে অদল-বদল মান্ধাতার আমলে দেখা যাইত। তাহা অবশ্য আজ-কালকার দুনিয়া হইতে উঠিয়া গিয়াছে। তাহার ঠাঁইয়ে দেখিতে পাই মুদ্রার সাহায্যে মূল্য-নিরূপণ এবং মূল্যে মূল্যে সমতা-স্থাপন ও কাটাকাটি। আমদানি-রপ্তানির কারবারেও সেই নিয়মটাই খাটিতেছে। তবে এই সমতা-স্থাপনের কারবারে মুদ্রার ঠাঁই এক প্রকার নাই বলিলেই চলে।

আমদানিতে রপ্তানিতে যদি সমতা না ঘটে অর্থাৎ যদি পরস্পর কাটা-কাটির সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে সমতা-স্থাপন এবং কাটাকাটি না ঘটা পর্য্যন্ত বাণিজ্য-জগতে অস্থিরতা বিরাজ করে। ঘরোআ বাজারে মূল্য-বৃদ্ধি নামক "অসাম্য" ঘটিলে মাল-স্রষ্টারা লোভে পড়িয়া অধিক পরিমাণে মাল তৈয়ারী করিতে লাগিয়া যায়। মালের পরিমাণ বাড়িবামাত্র ক্রমশঃ আবার দাম কমিতে সুরু করে। শেষ পর্য্যন্ত ক্রেতায় বিক্রেতায় সাম্য দেখা দেয়। আমদানি-রপ্তানির মুল্লুকেও এই সোজা নিয়মটাই সর্ব্বদা কাজ করে। নানা দিক্ হইতে নানা শক্তি আসিয়া অসাম্যের অবস্থাকে সাম্যের দিকে লইয়া যায়।

বর্ত্তমান যুগে আমদানিকারক এবং রপ্তানিকারক দেশ ও লোকের সংখ্যা খুববাড়িয়াছে। অধিকন্তু, কোন্ দেশের চাহিদা বাড়িবামাত্র কোন্ দেশে মাল তৈয়ারী করিবার হুজুগ চাগে তাহা অনেক সময়েই ধরিতে পারা যায় না। এই সকল কারণে বিশ্ব-বাণিজ্যের সমতা-সাধন কাণ্ডটা সহজে পাকড়াও করা সম্ভব নয়।

কাব্যাতি এই সাধারণ সূত্র দিয়াই জটিলতম লেনদেন-ময় বিশ্ব-ব্যবস্থার ব্যাখ্যা করিতেছেন। বুঝা যাইতেছে যে,—ধনবিজ্ঞান-বিদ্যার অন্যতম জন্ম-দাতা ইংরেজ-রিকার্ডো উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যে সকল সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়া গিয়াছেন, এক শতাব্দী পরেও আমরা সেই সকল সিদ্ধান্তই সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছি।

আর একটা সূত্র কাব্যাতির গ্রন্থে পরিষ্কাররূপে ধরিতে পারা যায়। ইনি বলিতেছেন যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সমতা সম্বন্ধে যে কথা বলা হইল তাহা পুরাপুরি খাটে সোণায় প্রতিষ্ঠিত মুদ্রানীতির আমলে। দুনিয়ায় একটা বড় গোছের লড়াই বাধিবামাত্র আমদানি-রপ্তানির কারবারে সমতা বাঁচাইয়া চলা খুবই কঠিন। তখন আন্তর্জ্জাতিক বৈঠক ডাকিয়া টাকার বিনিময়-হার সম্বন্ধে দর-কষাকষি করিতে হয়। অধিকন্তু, প্রত্যেক দেশেই তখন গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ এবং আইন-কানুনই ব্যবসা-বাণিজ্যের হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতারূপে দেখা দেয়। কিন্তু তখনও এই সকল বৈঠক এবং সরকারী শাসনের সাহায্যে একটা চলনসই বাণিজ্যিক "স্থিতি" বা সাম্য খাড়া করিয়া রাখিবার চেষ্টাই চলিতে থাকে।

গ্রন্থকারের তৃতীয় বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। লড়াইয়ের পর হইতে মুদ্রায় মুদ্রায় বিনিময়ের হার লইয়া মহা দুর্য্যোগ চলিতেছে। যে সকল দেশের মুদ্রা-প্রণালী এখনো পুনর্গঠিত হইয়া স্থিরতা লাভ করে নাই, তাহাদের অসুবিধা ঢের। কাব্যাতির মতে কোনো প্রকার কৃত্রিম কৌশলে সিক্কার-স্থিরতা আনা সম্ভবপর হইবে না। বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব্বে যেরূপ সোনায় প্রতিষ্টিত সিক্কা-প্রণালী প্রচলিত ছিল সেইরূপ ব্যবস্থাই পুনরায় কায়েম করা আবশ্যক।

## ৪। রুশ চাষী ও মূল্য-তত্ত্ব

আমাদের ভারতে এক শ্রেণীর পণ্ডিত আছেন। তাঁহারা চাষীদিগকে পল্লী-প্রেমিক, কুটির-শিল্পী, পরিবার-সেবী রূপে বিবৃত করিয়া থাকেন। তাঁহাদের দর্শনে চাষী-চরিত্র সহুরে-চরিত্র হইতে পুরাপুরি পৃথক। এই ধরণের মত কোনো কোনো বিদেশী পণ্ডিতের মতেরই ছায়াবিশেষ। রুশিয়ায় এই দর্শন বিরাট আকার ধারণ করিয়াছে। নারদ্নি-প্রবর্ত্তিত "কট্টর স্বদেশী" দল এইরূপ মতের প্রচারক।

এই মত কতটা টেকসই তাহার বিচারও চলিতেছে বহুদিন ধরিয়া। সম্প্রতি রুশ পণ্ডিত স্তুদেনস্কি-প্রণীত দুইখানা গ্রন্থ বাহির হইয়াছে। কৃষি-ব্যবস্থাকে মূল্য-বিজ্ঞানের ভিতর ফেলিয়া লেখক আর্থিক জগতের একটা নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন।

বর্ত্তমান জগতে চাষ-আবাদ বলিলে দুই শ্রেণীর কাজ বুঝিতে হইবে। প্রথমতঃ আধুনিক বা নব্য কৃষি-ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থাকে পুঁজিনীতি-শাসিতরূপে

বিবৃত করা যাইতে পারে। আজকালকার ফ্যাক্টরিতে, ব্যাঙ্কে, আমদানি-রপ্তানিতে যে ধরণের "পুঁজি-শাহী" বা পুজিতন্ত্র চলে চাষ-আবাদের কাজেও সেই ধরণেরই মূলধন-মাহাত্ম্য, মজুর-মালিক সম্বন্ধ, বাজারে কেনা-বেচার রীতি দেখা যায়।

বর্ত্তমান জগতের অন্য প্রকার চাষ-ব্যবস্থা হইতেছে প্রাক্-পুঁজিশাহীর অন্তর্গত। এই ব্যবস্থাকে সহজে "সেকেলে", আদিম বা মান্ধাতার আমলের কৃষিকর্ম্ম বলা চলে। এই কৃষিকে "প্রাকৃত" বলিলে পুঁজি-নিয়ন্ত্রিত কৃষিকে "সংস্কৃত" বলিতে পারি।

সাধারণতঃ পণ্ডিতগণের বিশ্বাস যে, এই দুই ধরণের চাষ-আবাদে দুই বিভিন্ন ধন-সূত্র খাটে। "প্রাকৃত" কৃষিতে মজুরির নিয়ম, দামের নিয়ম, খরচপত্রের নিয়ম যেরূপ তাহা এ কালের নিয়ম দেখিয়া বুঝা যায় না। এই মতের বিরুদ্ধে রায় দিয়া স্তুদেন্স্কি বলিতেছেন যে,—সকল প্রকার চাষ-ব্যবস্থায়ই এক বিনিময়-নীতি, এক মুদ্রা-নীতি, এক মূল্য-নীতির প্রয়োগ হইয়া থাকে। সর্ব্বত্রই পুঁজি-নীতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রতিযোগিতা, টক্কর, বাজারের দর-কষাকষি তথাকথিত "সেকেলে," আদিম বা "অ-সভ্য" কৃষি-দুনিয়ায়ও পাকড়াও করা সম্ভব।

স্তুদেন্স্কির বস্তুনিষ্ঠ, অঙ্ক-নিষ্ঠ গবেষণায় কতকগুলা নতুন তথ্য বাহির হইয়া পড়িয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বকার কৃষিয়ায় চাষীরা উৎপন্ন ফসলের কিয়দংশ বাজারে বেচিত। নিজ পরিবারের ভরণপোষণই তাহাদের কৃষিকর্ম্মের একমাত্র লক্ষ্য থাকিত না।

কট্টর "স্বদেশী আদর্শের" প্রচারকেরা বলিয়া থাকেন যে, "অ-সভ্য" চাষীরা পারিবারিক ভোগের জন্য যেটুকু দরকার তাহার বেশী ফসল উৎপাদন করে না। স্তুদেন্স্কি বলিতেছেন,—তাহা হইলে প্রত্যেক পল্লীর প্রত্যেক চাষীরই মাসিক বা বার্ষিক আয় ফসলের মাপে সমান হওয়া উচিত। কেননা খাওয়া-পরার জন্য প্রত্যেক পরিবারেরই সমান দরকার। আয়ের সমতা "প্রাকৃত" চাষী সমাজের একটা বিশেষত্ব বিবেচিত হওয়া উচিত। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে, "সেকেলে" কৃষি-ব্যবস্থায় আয়-সাম্য দেখা যায় কি ? যায় না। বরং উল্টাই দেখা গিয়াছে। কোনো ব্যক্তির আয় হয় ত মাত্র ২১ রুব্‌ল। আবার কোনো ব্যক্তির আয় ১০০ রুব্‌ল। পল্লী-গ্রামের আনাড়ি চাষীরা বাজার বুঝে না,—তাহারা খুব সাদাসিধা লোক,—নিজ গৃহস্থালীর জন্য জিনিষ

তৈয়ারী হইয়া গেলেই তাহারা স্বর্গসুখ অনুভব করে,—ইত্যাদি কথায় পশ্চাতে কোনো নিরেট যুক্তি নাই। "সেকেলে" চাষীরাও নিজ নিজ মেহনৎকে পারিবারিক প্রেমের ডাক বিবেচনা করে না। তাহার দাম কষিয়া দেখিতে তাহারা বেশ পটু।

## ৫। ধনবিজ্ঞানের জার্ম্মাণ-

ধনবিজ্ঞান-বিদ্যা বলিলে জার্ম্মাণরা সচরাচর যাহা বুঝিয়া থাকে ওপ্পেনহাইমার-প্রণীত এক গ্রন্থ তাহার এক সেরা নমুনা। লেখক ফ্রাঙ্কফুর্টের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিয়া থাকেন। সমাজ-তত্ত্ববিৎ রূপে ওপ্পেনহাই-মারের নামডাক বড়। বস্তুতঃ, বর্ত্তমান গ্রন্থ তাঁহার "সিষ্টেম্ ড্যর সোৎসিও-লোগী" ( সমাজ-বিজ্ঞান ) বিষয়ক বিপুল চিন্তা-সৌধের অন্যতম খুঁটা।

ফ্রান্সে, বিলাতে এবং ইতালিতে "ধনবিজ্ঞান" শব্দের জন্য "একনমী" "ইকনমিক্স" "একনমিয়া" ইত্যাদি শব্দ কায়েম হইয়া থাকে। জার্ম্মাণরা সাধারণতঃ তাহার জন্য "ফোল্‌কস্-হ্বির্টশাফ্‌টস্-লেরে" ( সার্ব্বজনীন আর্থিক ব্যবস্থা বিষয়ক বিদ্যা ) নাম ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত। কোনো কোনো জার্ম্মাণ লেখক "এ্যকোনোমী" শব্দও ব্যবহার করিয়াছেন। ওপ্পেনহাইমার তাঁহাদের অন্যতম।

কিন্তু ওপ্পেনহাইমারের বইয়ের নামে একটা বিশেষত্ব আছে। জার্ম্মাণির আর্থিক সাহিত্য বুঝিবার জন্য এই বিশেষত্বটার দিকে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। ফরাসীরা "একোনোমী পোলিটিক" আর ইংরেজরা "পোলিটিক্যাল ইকনমি" নাম ব্যবহার করিবার সময় "পোলিটিক্যাল" ( রাষ্ট্রীয় ) বিশেষণটার ইজ্জৎ বড় বেশী দেয় না। "ইকনমিক্স্" আর "পোলিটিক্যাল ইকনমি" দুই-ই তাঁহাদের চিন্তায় প্রায় একরূপ। কিন্তু জার্ম্মাণরা "পোলিটিশেন" শব্দ ব্যবহার করিবামাত্র তাহা হইতে পৃথক অ-পোলিটীক্যাল ( অ-রাষ্ট্রীয় ) অতএব "রাইণ" ( অর্থাৎ অমিশ্র ) একটা কিছু খাড়া করিতে অভ্যস্ত। আর্থিক ব্যবস্থা ( "হ্বির্টশাফ্‌ট্" ) বিষয়ক "লেরে" বা বিদ্যাটা জার্ম্মাণ চিন্তায় দ্বিবিধ। প্রথমতঃ, ইহা অমিশ্র বা স্বতন্ত্র অর্থাৎ অন্য কোনো বিদ্যার আনুষঙ্গিক নয়। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রভাবে এই বিদ্যার অন্তর্গত বস্তুর রূপান্তর ঘটিয়া থাকে। অতএব সেই দিক হইতেও এই বিদ্যার আলাদা

আলোচনা হওয়া কর্ত্তব্য। এই দুই ধরণের বিদ্যাই ওপ্পেনহাইমারের গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে।

প্রথম খণ্ডের আরম্ভেই গ্রন্থকার বিদ্যার "তত্ত্বাংশ" এবং "কলা" এই দুই বস্তুর প্রভেদ বিচার করিয়াছেন। "ধনবিজ্ঞানের তত্ত্বকথা" কি তাহার বিশ্লেষণ আছে। এই তত্ত্বের "সীমানা" কোথায় তাহা জানান হইয়াছে। "সমাজ" কাহাকে বলে এবং "আর্থিক ব্যবস্থার বহির্ভূত" সমাজ-জীবনে যাহা কিছু থাকিতে পারে তাহার উল্লেখও বাদ পড়ে নাই। পরে আলোচিত হইয়াছে আর্থিক উদ্দেশ্য সাধনের বিভিন্ন উপায়সমূহ। এইগুলা দুই শ্রেণীর অন্তর্গত :—( ১ ) রাজনৈতিক, ( ২ ) অর্থনৈতিক।

এই গেল ভূমিকা। তাহার পর আলোচিত হইয়াছে আলোচনা-প্রণালী। ধনবিজ্ঞানের সমস্যাগুলা কোন্ কোন্ প্রণালীতে কিরূপ আলোচিত হয় তাহার পরিচয় পাইতেছি। আলোচনা-প্রণালীর ক্রমবিকাশ দেখান হইয়াছে। প্রথমেই আছে "ক্লাসিক্যাল" প্রণালীর কথা। তারপর আছে "ঐতিহাসিক" প্রণালীর কথা। "ঐতিহাসিক"-পন্থীরা "ক্লাসিক"-পন্থীদিগকে কিরূপ সমালোচনা করিয়া থাকে তাহার বৃত্তান্ত আছে। বিজ্ঞান-রাজ্যের এই "দ্বন্দ্ব" কেমন করিয়া সমন্বয়ের পথে অগ্রসর হইতে পারে তাহাও বিবৃত হইয়াছে।

"আর্থিক সমাজ-কেন্দ্র" অথবা আর্থিক ব্যবস্থার সমাজ কেমন করিয়া স্তরে স্তরে গড়িয়া উঠিয়াছে বা উঠিতেছে তাহার আলোচনা এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। "সমবায়"-প্রণালী বিবৃত হইয়াছে। শ্রম-বিভাগ, শ্রেণী-বিভাগ, কর্ম্ম-বিভাগ একদিকে, আর অপর দিকে শৃঙ্খলাবিধান, ঐক্য-বন্ধন, সামঞ্জস্য-স্থাপন ইত্যাদি সমাজ জীবনের দুই তরফই যথোচিত উল্লেখ পাইয়াছে। এই ক্রমবিকাশের নিট্ ফল কি তাহাও বুঝান হইয়াছে। "সৃষ্টি"-প্রণালীর নিয়ম আর সৃষ্টি করিবার "শক্তিপুঞ্জ" এই উভয় দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছে। সমাজে শেষ পর্য্যন্ত আর্থিক কেন্দ্র হিসাবে কি কি বস্তু দেখিতে পাই ? প্রথমতঃ, ব্যক্তি এবং ক্ষুদ্র পরিবার, দ্বিতীয়তঃ, পরিবার বৃদ্ধি, এবং তৃতীয়তঃ, বাজার।

প্রথম খণ্ড এইখানেই খতম। এই সংক্ষিপ্ত সূচীপত্র হইতে অন্ততঃ এইটুকু আন্দাজ করা চলিবে যে, জার্ম্মাণির ছাত্র-ছাত্রীরা ধনবিজ্ঞান হিসাবে যে মাল হজম করিতে অভ্যস্ত ইংরেজ ও মার্কিণ পণ্ডিতদের ভারতীয় শিষ্যেরা তাহাকে সচরাচর ধনবিজ্ঞানের অন্তর্গত করিতে শিখে না।

দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম ভাগে গ্রন্থকার ব্যক্তিগত আর্থিক ব্যবস্থার আলোচনা করিয়াছেন। এই সঙ্গে বিদেশী মজুর-কেরাণীর কথা আলোচিত হইয়াছে। আর্থিক সমাজের উচ্চতর কর্ম্মচারীদের কৃতিত্ব বিশ্লেষিত হইয়াছে। কর্ম্ম-কেন্দ্রের সকল প্রকার লোকজনের পরস্পর আইনগত সম্বন্ধও নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তাহার পর আলোচিত হইয়াছে "গ্যেটার আর্ৎসয়গুঙ্" (ধনোৎপাদন)। মানবীয় সৃষ্টি-কার্য্যে এই "ধনোৎপাদন"ই একমাত্র বস্তু নয়। মাল-বিনিময় এবং যান-বাহন এই দুই প্রক্রিয়ার সাহায্যেও "সৃষ্টি" ঘটিয়া থাকে। ধন সৃষ্ট হইবার পর তাহার শাসন, স্বত্ব ইত্যাদি সংক্রান্ত নানা প্রকার প্রশ্ন উঠে। এই সম্পর্কে সম্পত্তি-বিষয়ক আইন, আয়ের নিয়ম, ধনদৌলতের ভাগাভাগি ইত্যাদি তথ্য সঙ্কলিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় ভাগের আলোচ্য বিষয় "নাট্সিওনাল এ্যকো-নোমিক" (অর্থাৎ সঙ্ঘগত আর্থিক ব্যবস্থা)। পূর্ব্বের আলোচিত ব্যক্তিগত আর্থিক ব্যবস্থা হইতে এই ব্যবস্থা পৃথক। এই আলোচনার গোড়ার কথা "বাজার"। বাজারের কথা,—বাজারে বিভিন্ন ব্যক্তির প্রতিযোগিতা ইত্যাদি আলোচনা করা হইয়াছে। তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিযোগিতার বিঘ্নস্বরূপ যে সব শক্তি দেখা দেয়,—যথা একচেটিয়া প্রভুত্ব, তাহার বিশ্লেষণও দেখিতেছি। বাজার-বিশ্লেষণের প্রথম তথ্য প্রতিযোগী শক্তিসমূহের "সমতা"-বিধান। এই সমতার উপর আর্থিক কর্ম্মমণ্ডলের "স্থিতি" প্রতিষ্ঠিত। সমতা ও স্থিতির আলোচনাই "মূল্য"-বিজ্ঞানের আসল কথা। সেই সকল কথা গ্রন্থে সুবিস্তৃতরূপে আলোচিতও হইয়াছে।

মামুলি দ্রব্যের দাম বিশ্লেষণ করিবার পর ওপ্পেনহাইমার মূলধনের কিম্মৎ স্বতন্ত্র ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। প্রত্যেক দ্রব্যেরই এক একটা স্থিতি-সমতার অবস্থা আছে সত্য। কিন্তু দ্রব্যগুলার ভিতর পরস্পর-সংযোগের ক্ষেত্রে আর একপ্রকার স্থিতি-সমতার অবস্থা আসিয়া দেখা দেয়। এই তুলনামূলক এবং আপেক্ষিক স্থিতিসমতার সম্বন্ধ আলোচনা না করিলে মূল্য-বিজ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকিতে বাধ্য। ওপ্পেনহাইমার সেই অসম্পূর্ণতা রাখেন নাই। আলোচনার প্রণালী নিম্নরূপ। প্রথমে গ্রন্থকার ভিন্ন ভিন্ন মালের সঙ্গে তুলনায় প্রত্যেক মালের দাম-সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়াছেন। তাহার পর দেখান হইয়াছে টাকার হিসাবে মালের দাম এবং মালের হিসাবে টাকার দাম। সঙ্গে সঙ্গে টাকার বাজারে কর্জ্জ নেওয়া-দেওয়ার প্রভাব বিশ্লেষিত হইয়াছে।

বাজার, তুলনামূলক স্থিতি, বিনিময়, ও মূল্য ইত্যাদি যে দুনিয়ায় প্রভাবশালী সেই দুনিয়ায় আর্থিক ব্যবস্থা শ্রমবিভাগ-নীতির জন্মদাতা। ধনবিজ্ঞানে কাজেই শ্রমবিভাগের কথা এক বড় ঘর অধিকার করে। শ্রমবিভাগ ঘটিয়া থাকে প্রধানতঃ দুই দফায়,—প্রথমতঃ, স্থান বা জনপদ হিসাবে, দ্বিতীয়তঃ, ব্যবসা বা কর্ম্মহিসাবে। বর্ত্তমান গ্রন্থে মাল-সৃষ্টির কাণ্ডে এবং মাল-বিতরণের কাণ্ডে দুই দিকেই শ্রমবিভাগ-নীতির প্রভাব-বিশ্লেষণ অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

গ্রন্থের শেষ কথা "কাপিটালিস্‌মুস" বা পুঁজি-নীতি। বর্ত্তমান জগতে আর্থিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে বড় বড় ধন-পুঁজির তাঁবে। তাহার প্রভাব বাজার-বিজ্ঞানের উপর অতি প্রবল। কি শ্রমবিভাগ, কি মূল্য, সর্ব্বত্রই কতকগুলা আত্ম-শাসনের বিরোধী শক্তির উদ্ভব হইয়াছে। আর্থিক কর্ম্মকেন্দ্রের কোনো অনুষ্ঠানই একমাত্র নিজের প্রভাবে পরিচালিত হইতে পারে না। কাজেই পুঁজিপতিদের চিত্তে আর্থিক দুনিয়া সম্বন্ধে নতুন নতুন চিন্তা জাগিয়াছে। মাল কিনিবার ক্ষমতায় জটিলতা প্রবেশ করিয়াছে। কাজে কাজেই মাল-বিতরণের কাণ্ড নেহাৎ সহজ ও সরল নয়। লাভ-লোকসানের হিসাব করা আজকাল বড় কঠিন। সুতরাং মাল-সৃষ্টির কাণ্ড যার পর নাই গোলমেলে। মুদ্রা-সমস্যা বর্ত্তমান যুগের এক বড় তথ্য। এই সমস্যা আর্থিক দুনিয়ার মাল-চলাচল কাণ্ডকে বিশেষরূপেই দুর্ব্বোধ্য করিয়া তুলিয়াছে। তাহার উপর দু'চার বৎসরের ভিতর একবার করিয়া জগতের সর্ব্বত্র এক একটা "হ্বির্টশাফ্‌ট্‌স্‌-ক্রিজে" (আর্থিক সঙ্কট) দেখা দেয়। ফলতঃ মাল-সৃষ্টির সঙ্গে মাল-বিতরণের এক বিরোধ আসিয়া জুটে। "কাপিটা-লিসমুসের" এই সমুদয় লক্ষণ বিশ্লেষণ করা ওপ্পেনহাইমারের কতকগুলা উল্লেখ-যোগ্য বিশেষত্ব।

পুঁজিনীতির ক্রমবিকাশ দেখান হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ধনবিজ্ঞান-সেবীদের চিন্তার ধারা কিরূপ ছিল তাহা বুঝান হইয়াছে। ম্যাল্‌থাস্‌, রিকার্ডো ইত্যাদি কেহই বাদ যান নাই। পরবর্ত্তী যুগের জন্য কার্ল মার্কস্‌কে প্রধান স্তম্ভ বিবেচনা করা হইয়াছে। অবশেষে পুঁজিনীতির বর্ত্তমান স্বরূপ এবং ভবিষ্যৎ গতি সম্বন্ধেও আলোচনা আছে।

ওপ্পেনহাইমারের মতামত খতাইয়া দেখা হইল না। জার্ম্মাণ ধনবিজ্ঞানের কাঠামটা বুঝিবার জন্য সম্প্রতি একখানা বইয়ের আলোচনা-রীতি ছুঁইয়া রাখা গেল মাত্র।

## বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষৎ

### ১। ধনবিজ্ঞানের গবেষণা-প্রণালী

অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে আমার স্বীকার্য্যগুলা অথবা নবীন ধনবিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত-সমূহ কাহাকেও বিনা বিচারে হজম করিতে উপদেশ দেওয়া আমার স্বধর্ম্ম নয়। আর্থিক জীবনে ভাঙন-গড়নের যুক্তি-শাস্ত্র বা কর্ম্ম-প্রণালীটা দেখাইলাম মাত্র।

এই সকল বিষয় লইয়া উচ্চশিক্ষিত বাঙালী মহলে তর্ক-প্রশ্ন গবেষণা-সমালোচনা অনুষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। দুঃখের বিষয়, এইদিকে বাঙালী পণ্ডিতগণের শৈথিল্য খুব জবর। ধন-বিজ্ঞান আর আর্থিক-জীবন সম্বন্ধে যুবক বাঙলার কর্ম্মক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে বিশাল।

বাঙলার প্রত্যেক জেলায়ই দুচার দশজন করিয়া উচ্চশিক্ষিত গবেষক আবশ্যক। দেশী-বিদেশী আর্থিক তথ্যে দক্ষতা লাভ করিবার জন্য আমরা বাঙ্লায় আজ পর্য্যন্ত বিশেষ কোনো চেষ্টা করি নাই। কিন্তু এখন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ধনবিজ্ঞানের গবেষণা সুরু করিবার জন্য দেশব্যাপী একটা আন্দোলন চালাইতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

কৃষি-ক্ষেত্রে বিচরণ, পল্লী-পর্য্যটন আর বস্তি-নিরীক্ষণ তথ্য-সংগ্রহের এক উপায়। কারখানায় কারখানায় ঘুরিয়া ফিরিয়া মজুরদের-মালিকদের ঘর বাহির দুই দিক বুঝিয়া বেড়ানো আর এক উপায়। রেল আফিসে, ষ্টীমার ষ্টেশনে, ফেরি ঘাটে, রাস্তায় সড়কে লোকজনের আর মালপত্রের গতিবিধি লক্ষ্য করা অন্য উপায়। তাহা ছাড়া ষ্টক-এক্স্চেঞ্জের দালাল-পাড়ায় নাক গুঁজিয়া পাটের "গন্ধ", তেলের "গন্ধ" শুঁকিয়া আসা অন্য এক উপায়। ইত্যাদি ইত্যাদি।

কর্ম্মগুলা স্বচক্ষে দেখা আর মুটে-মজুর-কিষাণ-জমিদার-মনিব-মালিক ইত্যাদি সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে গা ঘেঁসাঘেঁসি করা তথ্য-সংগ্রহের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রণালী সন্দেহ নাই। কিন্তু দুনিয়ার সকল মহলেই সব সময়ে কোনও লোকের পক্ষে হাজির থাকা সম্ভব নয়। কাজেই ছাপার হরপে প্রকাশিত ব্যাঙ্ক-বিবরণী, কারখানার বার্ষিক হিসাব, মজুর-সমিতির ইস্তাহার, গবর্মেণ্টের সরকারী বাণিজ্য-সংবাদ ইত্যাদি দলিল অত্যাবশ্যক। আর যে

সকল দেশের সংবাদপত্রগুলা দেশনিষ্ঠ সেই সকল দেশের সংবাদপত্রসমূহ বস্তুনিষ্ঠ ধনসাহিত্যের দলিল।

এই সকল প্রণালীতে তথ্য সংগ্রহ করিয়াই ফরাসী, জার্ম্মান, ইংরেজ, মার্কিণ, ইতালিয়ান পণ্ডিতেরা জীবন কাটাইতে অভ্যস্ত। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, তাঁহারা এখান ওখান সেখান হইতে "আর্থিক সংবাদ" সংগ্রহ করিতে করিতে অগ্রসর হন। এই সকল সংবাদ লইয়া মাঝে মাঝে দৈনিকে, সাপ্তাহিকে, মাসিকে লিখিবার রেওয়াজও তাঁহাদের আছে। বিদেশী ভাষা হইতে তর্জ্জমায় আর সঙ্কলনেও তাঁহারা পশ্চাৎপদ নন। তাহা ছাড়া মাল যখন বহরে বেশ পুরু হইয়া উঠে তখন তাঁহারা বিশ্বকোষ-সদৃশ ঢাউস ত্রৈমাসিকের শরণাপন্ন হন। তাহার পরেই "কপালে যদি থাকে" ত গ্রন্থ-প্রকাশের ব্যবস্থা। "বাঘা" "বাঘা" সকল পণ্ডিতের দস্তুরই এইরূপ —য়োরামেরিকায়।

এই ধরণের "নিয়মিত" আর্থিক-গবেষণার দৃষ্টান্ত বাঙলা দেশে খুব কমই দেখা যায়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের কর্ত্তব্যজ্ঞান আর পরিশ্রমনিষ্ঠা এখনো যুবক বাঙলায় অনেকটা অজ্ঞাত। কিন্তু এই দিকে সকলে মিলিয়া দলবদ্ধ ভাবে কাজ করিবার সময় আসিয়াছে। "বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষৎ" নামক একটা গবেষক-ও-লেখক-সঙ্ঘ কায়েম করা আবশ্যক।

## ২। রাষ্ট্র-শক্তির আর্থিক সদ্‌ব্যবহার

এইখানে আর একটা কথা মনে রাখা চাই। কাউন্সিল-অ্যাসেম্‌ব্লির আসল কাজ হইতেছে আইন-কানুন তৈয়ারি করা। আর এই আইন-কানুনের বার আনা চৌদ্দ আনা অংশ হইতেছে ধনদৌলত-সম্পর্কিত। বহির্ব্বাণিজ্য অন্তর্ব্বাণিজ্য সম্বন্ধে বিধি-ব্যবস্থা কায়েম করা এই সকল আইন-গঠনের অন্তর্গত। রেলের আইন, জাহাজের আইন তাহাদের অন্যতম। আর ফ্যাক্টরি-কারখানার শাসন-পরিচালনাও এই সব আইনের অধীনেই চলিয়া থাকে।

বাঙলাদেশে কাউন্সিল-অ্যাসেম্‌ব্লির সভ্য অথবা উমেদার আর কংগ্রেস-কন্‌ফারেন্সের সভ্য অথবা উমেদার গুন্‌তিতে আজকাল কম নন। তাঁহাদের প্রত্যেকের পক্ষেই আর্থিক আইন-কানুনের নানা কথা সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চয় করা কর্ত্তব্য। সেই জ্ঞান বিস্তার করাই বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষদের অন্যতম লক্ষ্য থাকিবে।

রাষ্ট্র একটা বিপুল যন্ত্র। লোকহিতের বাহন স্বরূপ এই যন্ত্রকে যখন-তখন অস্বীকার করিয়া চলা উচিত নয়। বস্তুতঃ রাষ্ট্র-যন্ত্রকে ভারত-সন্তানের কব্জায় আনা চাইই-চাই। কিন্তু রাষ্ট্রকে হাতিয়ারের মতন ব্যবহার করিতে হইলে পাকা কারিগর হওয়া আবশ্যক। আর্থিক হিসাবে দেশকে বড় করিয়া তুলিবার জন্য রাষ্ট্রকে কত উপায়ে নিজের কব্জায় আনা সম্ভব সে সম্বন্ধে বাঙালী স্বদেশ-সেবকগণ এখনো বেশ সজাগ হইয়া উঠেন নাই। রাষ্ট্রশক্তির আর্থিক সদ্ব্যবহার করিতে হইলে আমাদিগকে দলে দলে নতুন নতুন যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে হইবে। সেই যোগ্যতা বাড়াইবার জন্য আর তাহা সমাজের নানাস্তরে ছড়াইবার জন্য যুবক বাঙলার ধনবিজ্ঞানসেবীরা সঙ্ঘবদ্ধ হউন।

## ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা

অর্থশাস্ত্রের নানা তত্ত্বের কথা এতক্ষণ আলোচনা করা গেল। এইবার কাজের কথা, ভাতকাপড়ের কথা পাড়িতেছি। কোন্ কোন্ দিকে আমরা এখনি নতুন নতুন কারবার খুলিতে পারি তাহার কথাই আলোচনা করিব।

### ১। বিদেশে বাঙালী বণিক

প্রথমেই বহির্ব্বাণিজ্যের দিকে যুবক বাঙলার নজর টানিয়া আনিতে চাই। শত শত রকমের কাঁচা ও পাকা মাল আর শত শত রকমের যন্ত্রপাতির কথা বলা যাইতে পারে। সে সব কথা না বলিয়া বহির্ব্বাণিজ্য সম্বন্ধে মাত্র রপ্তানি-বিষয়ক একটা অঙ্গের উল্লেখ করিব। বিদেশে আড়ৎ কায়েম করিবার কথা বলিতেছি। পয়সা রোজগারের এ একটা বড় উপায়। এই বিষয়ে বিদেশী ব্যবসায়ীদের নিকট আমরা অনেক কিছু শিখিতে পারি।

মার্কিণ বেপারীরা আমাদের দেশে মাল বেচে। কিন্তু তাহারা বাঙালী বা অন্যান্য ভারতবাসীর নিকট একমাত্র চিঠিপত্র লিখিয়াই এদেশের সঙ্গে যোগাযোগ কায়েম করে এরূপ নয়। ভারতে আমেরিকার কনসাল আছে, বোম্বাই, কলিকাতা ইত্যাদি সহরে। কনসাল ভারতের দোকান-হাট, ভারতীয় নর-নারীর চাহিদা ও জীবনযাত্রাপ্রণালী, ভারত-গবর্ণমেণ্টের আর্থিক আইন-কানুন সম্বন্ধে ফী সপ্তাহেই মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের নিকট খবর পাঠাইয়া থাকে। অপর দিকে আমেরিকার ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে ভারতীয়

বেপারীদিগকে সংবাদ দেওয়াও কনসালের কাজ। কিন্তু দশ কোটি মার্কিণ নরনারী কি দু'চার জন কন্‌সালের কাজের উপর নির্ভর করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে?

থাকে না। তাহারা ভারতে নিজ নিজ ব্যবসার জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র খাশ প্রতিনিধি পাঠাইয়া দেয়। এই প্রতিনিধিরা সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর অন্তর্গত। কেহ কেহ কলিকাতায়, বোম্বাইয়ে অথবা অন্যান্য স্থানে মার্কিণ মালের দোকান খুলিয়া বসে। আর এক প্রকার প্রতিনিধির কাজ হইতেছে শীতকালে ভারত-পর্য্যটন। "রথ দেখা আর কলা বেচা" একসঙ্গে চলিতে থাকে। ভারতের নানা সহর ও গঞ্জ ঘুরিয়া তাহারা বাঙ্গালী, মাড়োয়ারি ইত্যাদি ব্যবসাদারদের সঙ্গে মোলাকাৎ করিয়া সকল প্রকার তথ্য সংগ্রহ করে। বহুবিধ মার্কিণ মালের অর্ডার পর্য্যন্ত পর্য্যটক-প্রতিনিধিদের হাতে আসিয়া পড়ে।

জাপানী বেপারীরা কি করিতেছে? তাহারা জাপানে বসিয়া ভারতবাসীর নিকট চিঠিপত্র ঝাড়িয়া ক্ষান্ত হয় না। তাহারা কলিকাতার ক্লাইভ ষ্ট্রীট অঞ্চলে একটা জাপানী বাজার কায়েম করিয়াছে। নাম তাহার "ইন্দো-জাপানীজ কমার্শ্যাল মিউজিয়াম"। এই প্রদর্শনী বা সংগ্রহালয়ে এক প্রকার গোটা জাপানই মজুত। বাঙালীরা বাঙলা দেশে বসিয়াই রকমারি জাপানী মালের নমুনা দেখিতে পাইতেছে, আর নমুনা মাফিক অর্ডার দিতেছে।

মার্কিণ, জাপানী, ইংরেজ বা অন্যান্য বড় বড় ব্যবসায়ীর ধরণ-ধারণ যুবক বাঙলাকে আজ আত্মস্থ করিতে হইবে। ভারতীয় মালের আড়ৎ, ডিপো বা সংগ্রহালয় আমাদিগকে কায়েম করিতে হইবে হাম্বুর্গে, নিউ ইয়র্কে, তোকিওয়, জেনোয়ায়: কোন্ কোন্ বিদেশী মুল্লুকে ভারতীয় বেপারীদের আড্ডা গাড়া আবশ্যক এই বিষয়ে সন্ধান দেওয়া কঠিন নয়।

দেখিতে হইবে ভারতীয় মালের বাজার সব চেয়ে বড় কোন্ কোন্ দেশে? ভারতবর্ষ যত মাল বিদেশে বেচে তাহার শতকরা ২১ অংশ যায় বিলাতে। তাহার পরেই জাপান আমাদের বড় খরিদ্দার। জাপানে যায় শতকরা ১৫ অংশ। আজকাল তৃতীয় ঠাঁই আমেরিকার। মার্কিণরা আমাদের বিদেশী রপ্তানির শতকরা ১০'৪ অংশ কিনিয়া থাকে। ১৯২৬ সনে জার্ম্মাণিতে গিয়াছে শতকরা ৭ অংশ মাত্র। কিন্তু জার্ম্মাণিতে ভারতের মাল আরও বেশী,—প্রায় ডবল কাটিবার কথা। ফ্রান্সে যায় শতকরা ৫'৫ অংশ।

ইতালির বাজারে ভারতীয় রপ্তানির শতকরা ৫ অংশ কাটে। এই ৫ অংশের কিম্মৎ ১৯।২০ কোটি টাকা।

বিলাতের কথা বাদ দিলে দেখিতেছি পাঁচটা বড় দেশের সঙ্গে আমাদের বেচার সম্বন্ধ। তাহার ভিতর যে সকলের নীচে, যেমন ইতালি,—সে ই প্রায় ২০ কোটি টাকার ভারতীয় মাল কিনিয়া থাকে। অতএব যদি বলি যে এই পাঁচ দেশে বাঙালী ব্যবসাদারদের ২০।২৫ টা আড়ৎ একসঙ্গে চলিতে পারে তাহা হইলে অত্যুক্তি করা হইবে না। মাসিক হাজার টাকা খরচ করিতে পারিলে প্রত্যেক দেশেই ছোট ভাবে এক একটা আড়ৎ, এজেন্সি বা বাণিজ্য-সংবাদের ডিপো খাড়া করিয়া যথেষ্ট লাভবান হইবার সম্ভাবনা আছে। এ কাজে প্রচুর পুঁজির প্রয়োজন হয় না।

## ২। ছোট খাটো রেলপথ

এইবার অন্তর্ব্বাণিজ্যের কোনো কোনো অঙ্গ সম্বন্ধে দুএক কথা বলিব। প্রথমেই হয়ত মনে উঠিবে চায়ের কিম্বা কয়লার কথা। অথবা হয়ত পাট-চাষীদিগকে বিক্রয়-সঙ্ঘে আবদ্ধ করিবার আন্দোলনটা নজরে আসিবে। আমি সেই দিকে সম্প্রতি দৃষ্টি ফেলিতেছি না।

আমরা সকলেই জানি যে বরিশালের মাল কলিকাতায় যায় আর কলিকাতার মাল আসে জলপাইগুড়িতে। আমরা মালগুলা চোখে দেখি আর বেপারীদের নাম ধাম জানি অথবা বাজারের দোকানপাটগুলার বহর দেখিয়া অন্তর্ব্বাণিজ্যের খুঁটাগুলার সংস্রবে আসি। কিন্তু এই মাল চলাচলের আর একটা কাণ্ড আছে। সে দিকে আমাদের নজর খুব কমই পড়ে। প্রশ্নটা হইতেছে,—মালগুলার চলাচল হয় কি করিয়া? এই চলাচল-কাণ্ডের ভিতর টাকা রোজগারের ফিকির কিরূপ? যাতায়াতের পথ, গমনাগমনের সুযোগ, যান-বাহন ইত্যাদির সঙ্গে একটা বিপুল ব্যবসা জড়িত আছে। তাহাতেও ক্রোর ক্রোর টাকা লাভ হয়। কিন্তু "ট্র্যান্স্‌-পোর্ট" নামক ব্যবসার দিকে বাঙালী ব্যবসায়ীদের নজর এখনো ভাল করিয়া পড়ে নাই।

প্রথমেই বলি রেলের কথা। রেলের নাম শুনিবামাত্রই আমরা সকলে আঁৎকাইয়া উঠি। বাঙালীর তাঁবে বিপুল পুঁজিই বা কোথায় আর বাঙালীর কর্ম্মদক্ষতাই বা কোথায়? কিন্তু রেল চালানো বলিলে আমি বি, এন, আর

বা ই, বি, আর ইত্যাদি জাম্বুমান পরিচালনার কথা বলিতেছি না। অত লম্বাচৌড়া স্বপ্ন দেখিয়া "পরকাল ঝরঝরে" করিতে চাহি না। বাংলা দেশের প্রত্যেক জেলাতেই ছোট খাটো রেল চালাইবার সুযোগ অনেক আছে। ২৫।৩০।৩৫ মাইলের রেল চালাইবার কাজে বাঙালীর টাকাও জুটিতে পারে আর লাভবান হইবার সম্ভাবনাও আছে। যশোহর-ঝিনাইদহ রেল বাঙালীব কব্জায়ই চলিতেছে। আর তাহাতে পনর-বিশ লাখ টাকার বেশী লাগিতেছে না। যেখানে যেখানে বড় হাট, ষ্টীমার ঘাট বা রেল ষ্টেশন অথবা জমিদারের কাছারি সেইখানেই লাভজনক ছোট রেলের সুযোগ আছে।

## ৩। নৌকায় এঞ্জিন

এইবার জলপথে যাতায়াতের ব্যবসার কথা বলিব। বর্ত্তমান যুগ রেল-এরোপ্লেনের যুগ বটে। কিন্তু খাল-দরিয়ার ইজ্জৎ এ যুগে কম নয়। বিলাতে খালের স্বপক্ষে তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। কয়েক বৎসর হইল একটা খাল-কমিশন বসিয়াছিল। কমিশনের প্রস্তাবিত ফর্দ্দ বিরাট কাণ্ড। ফরাসীরাও নদীগুলাকে চাঁছিয়া-ছুলিয়া দুরস্ত করিতেছে। রোণের খালগুলা প্রসিদ্ধ। এই দিকে সকলের টেক্কা জার্ম্মাণি। রাইণের সঙ্গে ডানিউবের যোগাযোগ প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিল। অর্থাৎ উত্তর সাগর হইতে কৃষ্ণ সাগর পর্য্যন্ত মালের চলাচল সাধিত হইবে জলপথে,—দরিয়ার আর খালের উপর দিয়া।

খাল কাটার খরচ অনেক। ইংরেজ-জার্ম্মাণ মাপ অতি-উঁচু। কিন্তু দরিয়ার উপর ষ্টীমার চালানো অত্যধিক মারাত্মক খরচের কারবার নয়। বিদেশী ষ্টীমার-কোম্পানীর সঙ্গে টক্করের কথা উঠিবে। কিন্তু টক্কর আর ঠোক্কর খাইতে খাইতেও বাঙালীর ইষ্ট বেঙ্গল রিভার ষ্টীম ন্যাভিগেশন কোম্পানী মাথা খাড়া করিয়া রহিয়াছে। মূলধন টাকা লাখ দশেক মাত্র।

আমাদের কানে ষ্টীমার-জাহাজ ইত্যাদি শব্দ রেলের মতনই ভয়ঙ্কর মালুম হইয়া থাকে। এ সব চিজে দন্তস্ফুট করা কঠিন এইরূপ আমাদের বিশ্বাস। তাহা হইলে জলপথের যানবাহন সম্বন্ধে আরও এক ধাপ নীচে নামিয়া কথাটা পরিষ্কার করিতেছি। আমাদের মামুলি ছিপ, বজরা, পান্সী ইত্যাদি শ্রেণীর নৌকাগুলাকে "আধুনিক" ভাবে "রূপান্তরিত" করিতে পারিলেও অনেক ফায়দা হইতে পারে। জাপানীরা মানোয়ারী জাহাজ কব্জায় রাখে।

ডুবো-জাহাজে "মাৎস্য-স্থায়" চালাইতেও তাহারা মজবুদ। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তোকিওর সুমিদা-গাওয়া দরিয়ায় মোসাফিরি করিয়াছি "সেকেলে" নৌকায়। চলিত সে সব নাও ষ্টীম-এঞ্জিনের জোরে। বিক্রমপুরের "গয়নার নাও"য়ে ছোট একটা তেলের এঞ্জিন লাগাইতে পারিলে বাঙালীরাও জাপানী জীবনের ছটাক খানেক আধ্যাত্মিকতা চাখিতে সমর্থ হইবে। এই কাজের জন্ম এঞ্জিনিয়ারিং বিস্থায় মহা দিগ্‌গজ হইবার দরকার নাই। বিপুল কলকজা বা কারখানার যন্ত্রপাতি চাই না। এই দিকে যুবক বাঙলার বাণিজ্যিক ভাবুকতা প্রযুক্ত হউক।

## ৪। মোটর বাস

আর একবার স্থলপথের কথা বলিব। বড় রেল আছে, ছোট রেলের কথা বলিলাম। কিন্তু তথাপি মামুলি সড়কে যানবাহনের ব্যবসা অনেক চলিতেছে আর চলিতে পারেও। প্রত্যেক জেলায়ই বড় বড় হাট, কাছারি, ষ্টীমার ঘাট বা রেল ষ্টেশনের নিকট এক একটা মোটর কোম্পানীর ব্যবসা-ক্ষেত্র আছে। ব্যক্তিগত ভাবে গোটা চার পাঁচেক লরি, বাস ইত্যাদি শ্রেণীর অটোমোবিল চালাইবার কাজ সর্ব্বত্রই ঢুঁড়িয়া পাওয়া যায়। বাঙলা দেশে ট্যাক্সি-অটোমোবিলকে আর বিলাস সামগ্রী বিবেচনা করা হয় না। এই সবের বিরুদ্ধে বাঙালী নরনারীর কোনো বিদ্বেষ আর নাই। বস্তুতঃ মোটরের সওয়ারি আর খরিদ্দার ভারতে বেশ দ্রুত বাড়িতেছে। ১৯২৫-২৬ সনে ভারতবাসী প্রায় ৪½ কোটী টাকার অটোমোবিল খরিদ করিয়াছে। ১৩,০০০ মোটর গাড়ী, ২০০০ মোটর সাইকল্, আর ৫০০০ মোটর বাস আমদানি হইয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে ফী বৎসর গড়ে আমদানি হইত মাত্র ২০০০ গাড়ী আর ১০০০ সাইকল্। তখনকার দিনে বাস এত কম আসিত যে তাহা স্বতন্ত্র ভাবে গুণিয়া দেখা হইত না।

দেখিতেছি লোকেরা মোটর চায়। এই বস্তুর বাজার বেশ গড়িয়া উঠিতেছে। বাজারটা বাড়ানোও সম্ভব। কাজেই যুবক বাঙলা বেশ বুঝিতে পারিতেছে যে মোটর গাড়ীর কেনা-বেচা নামক ব্যবসায় টাকা খাটানো লাভজনক ব্যবসা।

মোটর কেনা-বেচার ব্যবসায় আমেরিকা জগৎকে অনেক-কিছু শিখাইতেছে। সেখানকার ব্যাঙ্কগুলা গাড়ী খরিদ করিয়া গৃহস্থের নিকট বেচে।

গৃহস্থ বীমা-কোম্পানীর ঘরে গাড়ীটা বীমা করিয়া লয়। বীমার সার্টিফিকেটটা ব্যাঙ্কের ভাঁড়ার-ঘরে জমা থাকে। আর কিস্তীতে কিস্তীতে দাম শোধ করা হয়। মার্কিণ ব্যাঙ্কে আর বীমাকোম্পানীর নিকট যুবক বাঙলা কিছু কিছু সাগরেতি করিলে মোটর-ব্যবসায় হাতযশের সম্ভাবনা আছে।

## ৫। যন্ত্রপাতির ফ্যাক্টরি

ইংরেজ, জার্ম্মাণ, মার্কিণ ইত্যাদি বড় বড় জাতির "এলাহি কারখানা" যুবক বাঙলায় আজ সম্ভবপর নয়। আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রায় সর্ব্বনিম্ন ধাপগুলায় হাত মক্স করা আর সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু টাকা রোজগার করা বর্ত্তমানে আমাদের উচ্চতর আকাঙ্ক্ষার অন্তর্গত। সেই ধাপেরই কতকগুলা শিল্পফ্যাক্টরি চালাইবার দিকে আমাদের প্রত্যেক জেলায় কয়েকজন লোকের মোতায়েন থাকা চলিতে পারে।

ছোট রেল, ষ্টীম নৌকা, মোটরগাড়ী ইত্যাদি বিষয়ে ব্যবসা চালাইবার কথা বলিয়াছি। কিন্তু এই সকল "ব্যবসা"র সঙ্গে সঙ্গে অথবা পশ্চাতে কিছু কিছু "শিল্প"ও আবশ্যক। এঞ্জিন, লঞ্চ, গাড়ী, কলকব্জা ইত্যাদি জিনিষের হিকমত করিবার জন্য চাই নানা প্রকার কারখানা। যে কয়টা ব্যবসার কথা বলিয়াছি তাহার সবগুলাই যন্ত্রপাতির সন্তান, দাস বা আত্মীয়। অতএব প্রত্যেক জেলায়ই চাই কতকগুলা কারখানা। গ্যাস বা বিজলীর কলকব্জা, রবারের জিনিষ, লোহা লক্কড়ের মাল, স্ক্রু-প্যাঁচ ইত্যাদি বস্তু মেরামত করিবার জন্য ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। সোজা কথায়, গাড়ীর পায়া ভাঙ্গিয়া গেলে তাহার চিকিৎসাও চাই আর হাসপাতালও চাই। এই সব কারখানাকে এক কথায় "এঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্" বলা হইয়া থাকে।

এই ধরণের কারখানা বাঙ্‌লাদেশে একদম নতুন নয়। আজকাল ১৩৫টা ফ্যাক্টরি চলিতেছে। তাহাতে মজুর খাটে ২১,৮১৭ জন। আর টাকা খাটে বোধ হয় প্রায় ২৫ কোটি। কিন্তু এইগুলার কম-সে-কম ১০০টা বিদেশী তাঁবে। মাত্র ৩০।৩২টা বোধ হয় বাঙালীর পরিচালিত। বাঙালীর অধীনস্থ কারখানায় বোধ হয় মাত্র ১,২০০।১,৫০০ মজুরের অন্নসংস্থান হয়। অর্থাৎ বেশী লোকের অন্ন জুটে বিদেশীদের কারখানায়।

যাহাহউক এঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্‌গুলার প্রায় সবই কলিকাতা আর হাবড়া অঞ্চলে অবস্থিত। মফঃস্বল একপ্রকার এঞ্জিনিয়ারিং-হীন। "মাত্র ১০ জেলায়

এই সকল কারখানার কাজ চলিতেছে। তাহার বোধ হয় একটাও বাঙালীর কারবার নয়।

এঞ্জিনিয়ারিং কারখানার দিকে যুবক বাংলার মতিগতি ফিরিলে নানা-প্রকারে আমরা লাভবান হইতে পারিব। মফঃস্বলের নরনারীকে যন্ত্র-নিষ্ঠ ও মজুর-নিষ্ঠ করিয়া তুলিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এমন কি একমাত্র উপায় হইতেছে এই সকল কর্ম্মকেন্দ্র।

সরকারী তাঁবে রেল বাড়িতেছে। বাঙালীর তাঁবেও রেল, ষ্টীমার, মোটর বাড়াইবার সুযোগ দেখিতেছি। কাজেই মফঃস্বলের নানা কেন্দ্রে এক সঙ্গে বহুসংখ্যক এঞ্জিনিয়ারিং কারখানার খোরাক জুটিবার সম্ভাবনা। অধিকন্তু কারখানা দাঁড়াইয়া গেলে স্থানীয় লোকেরা নতুন নতুন কলকব্জা কিনিবার দিকে ঝুঁকিতে থাকিবে। টিউব-ওয়েল বা জলের জন্য নলকূপ বসাইবার খেয়াল মিউনিসিপ্যালিটি ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের মাথায় সহজেই বসিতে পারিবে। পয়সাওয়ালা লোকেরা নিজ নিজ বাড়ীর জন্য বিজলীর সরঞ্জাম, গ্যাসের সরঞ্জাম ইত্যাদি "আধুনিক" জিনিষপত্রের খরিদ্দার হইতে সুরু করিবে। তাহা ছাড়া সাবান, রং, কালী, ওষুধপত্র, কাচ, দেশলাই, পেন্সিল, বরফ, মোমবাতী, কৃত্রিম ঘী ইত্যাদি সংক্রান্ত নানাপ্রকার রাসায়নিক আর নিম-রাসায়নিক কারবারেও যন্ত্রপাতির ডাক পড়িতে বাধ্য। এমন কি আজকালকার দিনের কৃষিকর্ম্মও যন্ত্রপাতির সঙ্গে সুজড়িত। অর্থাৎ এঞ্জিনিয়ারকে বাদ দিয়া বর্ত্তমান যুগের কোনো আর্থিক আয়োজন চলিতে পারে না। কাজেই বৈদ্যুতিক অথবা অন্যবিধ যান্ত্রিক এঞ্জিনিয়ারিং-ঘটিত কারখানা খুলিলে যুবক বাঙলার পক্ষে লাভবান হইবার পথ প্রশস্ত।

এইখানে আমি খোলাখুলি আরও বলিতে চাই যে বৈদ্যুতিক, যান্ত্রিক, রাসায়নিক আর অন্যান্য এঞ্জিনিয়ারদের সংখ্যা না বাড়িলে যুবক বাঙলা সভ্যতার সিঁড়ির উঁচু ধাপে পা ফেলিতে পারিবে না। যন্ত্রপাতি আমার চিন্তায় আধ্যাত্মিক জীবনের অস্থিমজ্জা। বাঙলার নরনারীকে মানুষের বাচ্চা হিসাবে মজবুদ করিয়া তুলিতে হইলে প্রথমেই চাই যন্ত্রপাতির সঙ্গে নিবিড় কুটুম্বিতা স্থাপন। যুবক বাঙলায় যন্ত্র-সাধনা আর যন্ত্র-দর্শন সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ধনবিজ্ঞানের সঙ্গে এঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার পরস্পর মেলমেশ কায়েম করা আমি নিজ জীবনের অন্যতম কর্ত্তব্য সমঝিয়া থাকি। আনুষঙ্গিক ভাবে বলিতে পারি যে, ম্যালেরিয়াকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিবার কাজেও যন্ত্র-চালিত

পাম্পের সাহায্যে খানাডোবার জল নিষ্কাসন আবশ্যক হইবে। আর তাহার জন্য জরুরি কলকব্জার কারখানা আর এঞ্জিনিয়ারের কর্ম্মদক্ষতা।

## ৬। জমিদারের নয়া আয়

ছোট খাটো চাষে মধ্যবিত্ত বাঙালীর সুযোগ কতটা আছে বলা কঠিন। প্রথমতঃ হয়ত জমিই নাই। দ্বিতীয়তঃ চাষ-আবাদ সুরু করিতে হইলেও কম্‌সে-কম হাজার দেড় দুই টাকা পুঁজির দরকার হয়। তাহা প্রায় কোনো বি, এ, বি, এসসি পাশ করা যুবার ট্যাঁকে নাই।

দেড়-দুই-তিন বিঘা জমি যে সকল চাষীর আছে তাহাদের পক্ষে "সমবেত" ঋণ আর ক্রয়-বিক্রয় প্রণালীর আশ্রয় গ্রহণ করা আর্থিক উন্নতির একমাত্র উপায়। তবে সমবায়-ব্যাঙ্কগুলার উন্নতি নির্ভর করিতেছে শেষ পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের উপর। "রিজার্ভ ব্যাঙ্ক"টা গড়িয়া উঠিলে, ফরাসী রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মতন তাহাকে বাধ্য করাইয়া সমবায়-ব্যাঙ্কের জন্য সস্তায় টাকা ধার দিবার আয়োজন করা চলিতে পারে। মোটের উপর বুঝিয়া রাখা দরকার যে, দেড়-দুই-তিন বিঘা জমি হইতে রগড়াইয়া রগড়াইয়া বেশী কিছু টাকা রোজগার করা অসম্ভব।

কিন্তু চাষবাসকে এঞ্জিনিয়ারিং আর রসায়নের আওতায় আনিয়া ফেলিতে পারিলে বাঙলায় কৃষিকর্ম্ম নবীন ধনদৌলতের সূত্রপাত করিবে। শত শত বা হাজার হাজার বিঘার মালিকেরা নয়া ঢঙের জমিদার দাঁড়াইয়া যাইতে পারিবেন। এই বিষয়ে যুবক বাঙলার মাথা খেলানো অন্যায় হইবে না।

প্রথমেই চাই যন্ত্রপাতি। তারপর চাই সার। আমাদের গোবরের সারে আর চলিবে বলিয়া বিশ্বাস হয় না। বাঙলার গরুগুলা খায় কি? তার আবার গোবরের কিম্মৎ কতটুকু? চাই রাসায়নিক সার। এই দুয়ের জন্য নগদ টাকা ঢালিতে হইবে—বলাই বাহুল্য।

জার্ম্মাণিতে মামুলি জমিদার অর্থাৎ রাইয়ত-শাসক রাজাবাহাদুর আর নাই। অথচ জমিজমার আয় হইতেই লক্ষপতি লোক আছে অনেক। এই সব লোক মজুর বাহাল করিয়া হাজার হাজার বা শত শত বিঘার জমিতে শাক শব্জী হইতে ফলমূল, গম, ভূট্টা পর্য্যন্ত সবেরই আবাদ চালায়। তাহার সঙ্গে থাকে গরু, শূয়র, মুর্গী, মৌমাছি ইত্যাদির "চাষ"। দুধ, মাখম, পনির, ডিম, মাংস ইত্যাদি সবই উৎপন্ন হয়। নিজেরা কারবার

তদবির করে, রোজ আট-দশ-বার ঘণ্টা করিয়া খাটে। ব্যাঙ্কের ম্যানেজার, ফ্যাক্টরির ম্যানেজার ইত্যাদি শ্রেণীর লোক যেমন করিয়া যতখানি খাটে জমিদারেরাও ঠিক তেমন করিয়া ততখানি খাটিতে অভ্যস্ত। এই অভ্যাস আমাদের বাঙালী জমিদার সমাজে পয়দা হইয়া গেলে চাষ ব্যবসাটা আধুনিকতা লাভ করিতে পারিবে। আর সঙ্গে সঙ্গে কৃষিকর্ম্মে প্রচুর উপার্জ্জনও চলিতে থাকিবে। তবে এই ব্যবসা সাধারণ লোকের হাড়ে পোষাইবে না। যে সকল ব্যক্তি দুই চার বৎসর টাকা রোজগার না করিয়াও কারবারে টাকা ঢালিতে পারেন একমাত্র তাঁহাদের পক্ষে এই ধরণের নবীন চাষ বাঙালী জাতিকে উপহার দেওয়া সম্ভব।

## ৭। খদ্দরে টাকা রোজগার

মামুলি পাড়াগেঁয়ে "কুটির-শিল্পে" যুবক বাঙলার ভাত কাপড় জুটিতে পারে কিনা তাহার কিছু আলোচনা করা আবশ্যক। আমার বিশ্বাস এই দিকে আমাদের অনেকের কিছু কিছু দৃষ্টি থাকিলে ভাল হয়। টাকা রোজগারের পথ হিসাবে কি লিখিয়ে-পড়িয়ে লোক আর কি অন্যান্য শ্রেণীর লোক সকলেরই এই সম্বন্ধে মাথা খেলানো উচিত।

যন্ত্র-নিষ্ঠা আর যন্ত্র-দর্শন যুবক বাঙলায় আর্থিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রধান উপায় সন্দেহ নাই। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে "হস্ত-নিষ্ঠা" আর "হস্ত-দর্শন" আজও দুনিয়ার উচ্চতম দেশসমূহ হইতে সমূলে লোপাট হইয়া যায় নাই। আজও ইয়োরামেরিকার সর্ব্বত্র হাতের কাজ, কুটির-শিল্প, পরিবার-গত ছোট-খাটো কারবার চলিতেছে। চরম ভবিষ্যপন্থী ধনবিজ্ঞান-দক্ষ পণ্ডিতেরা আজও এই সবের স্বপক্ষে "যথাস্থানে" আর "নির্দ্দিষ্ট সীমানার ভিতর" রায় দিতে লজ্জিত বোধ করেন না।

দুনিয়ায় সাগরে সাগরে দেখিয়া আসিয়াছি পালের জাহাজ আজও হাওয়ার জোরে চলিতেছে। অর্থাৎ বিজলী, গ্যাস, কেরোসিন তেল আর ডীজেল মোটর এখনও ধরাখানাকে মামুলি মধ্যযুগের আর্থিক জীবন হইতে পুরাপুরি মুক্তি দিতে পারে নাই। ইতালির কোনো কোনো পল্লীতে মেয়েরা আজও ঘাড়ে বাঁক বহিয়া বাল্তি বাল্তি জল টানে। আর ব্যাভেরিয়ার মফঃস্বলে মফঃস্বলে গরুর গাড়ীও দুএকটা চোখে পড়িয়াছে।

ফ্রান্সের ওৎলোয়ার জেলায় প্রায় আশী হাজার লোক হাতের তৈয়ারি ফিতার কাজে প্রতিপালিত হয়। মেয়েরা এই শিল্পে ওস্তাদ। শিল্পটার কিছুকাল ধরিয়া দুর্গতি চলিতেছিল। প্যারিসে থাকিবার সময় লক্ষ্য করিয়াছি যে ফরাসী রিপাব্লিকের প্রেসিডেণ্ট হইতে সুরু করিয়া নামজাদা শিল্প-পতি পর্য্যন্ত সকলেই এই শিল্প আর ব্যবসাটাকে বাঁচাইবার জন্য যারপর-নাই চেষ্টিত।

তাঁহাদের যুক্তি অনেকটা নিম্নরূপ :—"মেয়েরা কৃষিকার্য্যের অবসরে বা অন্য অবকাশে ঘরে বসিয়া এই সকল শিল্প-কারুময় ফিতা তৈয়ারি করিতে অভ্যস্ত। অধিকন্তু শীতকালে যখন চাষ-আবাদ চলে না, তখন মেয়েদের পক্ষে হস্ত-শিল্পই প্রধান কাজ। এই শিল্পটা ফ্রান্স হইতে বিলুপ্ত হইলে দেশের মেয়েদের অর্থোপার্জ্জনের একটা বড় উপায় নষ্ট হইবে।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

ভারতে যন্ত্রচালিত কলকারখানা যতই বাড়ুক না কেন হাতের কাজ বড় শীঘ্র লুপ্ত হইবে না। পাশ-করা ডাক্তারের যুগেও "হাতুড়ে" ডাক্তাররা পয়সা রোজগার করিতেছে। "সেকেলে" ছুতার, মিস্ত্রী, ঘরামি, নুনিয়া, চুণিয়া, কামার, কুমার, ইত্যাদি কারিগর এখনো বহুকাল আমাদের সমাজে থাকিবেই থাকিবে। তবে যন্ত্রকলায় তাহাদের কিছু কিছু উন্নতির সম্ভাবনাও আছে।

হাতের তাঁত বাঙলা দেশে আজও চলিতেছে বিস্তর। কাপড়ের কলে মাত্র ১৩,৭৩৬ জন মজুরের অন্ন জুটিয়া থাকে। কিন্তু হাতের তাঁতী ২,১১,৪৯৯ জন। এই সকল কুটির-শিল্পে প্রায় ৫,০০,০০০ নর-নারীর অন্ন-সংস্থান হয়। মেদিনীপুর জেলায় প্রায় ১১,০০০ হাতের তাঁতে কাজ চলিতেছে। ঢাকা আর ময়মনসিংহে প্রায় ১২,০০০ করিয়া হাতের তাঁত চলে। ত্রিপুরা জেলায় প্রায় ১২,৫০০।

কাজেই যাঁহারা খদ্দরের জন্য প্রাণপাত করিতেছেন তাঁহারা আহাম্মুক নন। খদ্দর-শিল্পে বহু পরিবারের ভাত কাপড় জুটিতেছে। কুমিল্লার এক "অভয় আশ্রমের" ব্যবস্থায়ই ফী মাসে গড়পড়তা প্রায় ১০।১১ হাজার টাকার খদ্দর বিক্রী হয়। খদ্দর তৈয়ারি হয় মাসিক ১৩ হাজার টাকার। এই কারবারটা বর্ত্তমান জগতের হিসাবে বড় কিছু নয়। কিন্তু যুবক বাঙলার আর্থিক মাপকাঠিতে ইহাকে একটা উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব বিবেচনা করিতেই হইবে। অধিকন্তু, "খাদি-প্রতিষ্ঠানের" অঙ্ক হিসাব করিয়া দেখিয়াছি যে, ১৯২১ সনের তুলনায় আজ খদ্দরের দাম কমিয়াছে প্রায় অর্দ্ধেক।

অপর দিকে খদ্দর টেক্‌সই হইয়াছে ডবল। অর্থাৎ এই চার পাঁচ বৎসরে খদ্দরের উন্নতি চার গুণ।

খদ্দরের কারবারে একদিক হইল শিল্পের তরফ অর্থাৎ মালটা তৈয়ারি করা, অপর দিক হইতেছে ব্যবসা বা বাণিজ্য। অর্থাৎ বাজারে মাল ফেলা, ফেরি করিয়া বেচা, দোকান করা, হাটে যাওয়া এই কারবারের দ্বিতীয় দফা। সুতরাং খদ্দরে একমাত্র তাঁতী জোলা অথবা শীতকালের অবসরওয়ালা চাষীর অন্ন সংস্থান ঘটিতেছে এরূপ বিশ্বাস করা উচিত নয়। ইহাতে ব্যাঙ্ক-ব্যবসার আর ষ্টোর্সের যোগাযোগও আছে। অর্থাৎ সহরে নর-নারীর, এম, এ, বি, এল, ইত্যাদি পাশ-ফেলকরা লোকের মেহনৎ আর আয়ের পথও আছে।

খদ্দরের কারবারটা ভাল করিয়া চালাইতে পারিলে নানা শ্রেণীর অনেক বাঙালীরই দু'পয়সা আসিতে পারে। এই জন্য খদ্দরের কথা পাড়িলাম। কিন্তু কলের কাপড়ের সঙ্গে খদ্দর দাম হিসাবে অথবা গুণ হিসাবে টক্কর দিতে পারিবে কি না সে কথা স্বতন্ত্র। বাঙলাদেশের লোক আমরা যতই গরীব হই না কেন, আমাদের প্রায় প্রত্যেক পরিবারেরই কোনো না কোনো দিকে কিছু না কিছু বিলাসভোগ আছে। বিলাসের অর্থ সোজা। হয় অপেক্ষাকৃত অনাবশ্যক জিনিষ খরিদ করা হইয়া থাকে অথবা হয়ত দরকারী জিনিষের জন্য অপেক্ষাকৃত বেশী দাম দেওয়া হয়। এক কথায় আর্থিক হিসাবে বিলাসের অর্থ অপব্যয়। খদ্দরকে আমি সম্প্রতি এইরূপ "বিলাসের" সামগ্রীই বিবেচনা করিতেছি। অন্যান্য হাজার রকমের বিলাস-সামগ্রীর সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবিত্ত আর ধনী বাঙালী পরিবারে খদ্দরের বাতিক যদি কিছুদিন ধরিয়া লাগিয়া থাকে তাহা হইলে বহুসংখ্যক তাঁতী জোলা চাষী আর তথাকথিত শিক্ষিত "ভদ্রলোকে"র ঘরে হাঁড়ী চড়িবার সম্ভাবনা দেখিতেছি। সুতরাং "খদ্দর-বিলাসে" গা ঢালিবার জন্য আমি যুবক বাঙলার যে কোনো মহলে পাঁতি দিতে ইতস্ততঃ করি না।

বাঙলাদেশের সকল কারিগর, সকল মিস্ত্রী, সকল তাঁতী আর সকল চাষীকে অল্পদিনের ভিতর আধুনিকতম যন্ত্রপাতি-নিয়ন্ত্রিত কারবারে চালিত করিবার ক্ষমতা বাঙালী জাতির তাঁবে নাই। কাজেই "সেকেলে" "হাতুড়ে" "আদিম" আর্থিক ব্যবস্থা যেখানে যেখানে কিছু কিছু লাভজনক দেখিতে পাই সেই-খানেই যুবক বাঙলার অন্নের ব্যবস্থা আছে। বর্ত্তমান-নিষ্ঠা আমাদের আর্থিক

ভাঙন-গড়নের ভিত্তি। দূর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিয়া বর্ত্তমানের সুযোগগুলা তুচ্ছ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

## ৮। রকমারি ব্যাঙ্ক-ব্যবসা

ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় অন্নসংস্থানের কথা বলিতে সুরু করিলে আজ বাঙালী সমাজে কল্কে পাওয়া সম্ভবপর হইবে কিনা সন্দেহ। কেন না বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের পতনকাণ্ডে বাঙালীর চোখে ব্যাঙ্কিং-কারবার অতিমাত্রায় বিপজ্জনক বিবেচিত হইতেছে। কিন্তু যুবক বাঙলার পক্ষে অবিবেচকের মতন দীর্ঘশ্বাস ফেলিবার কোনো কারণ নাই। বাঙালীর ব্যবসা-শক্তি সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ সোজা। বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের মতন কম-সে-কম ২৫।৩০০ জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক বাঙলার মফঃস্বলে কারবার চালাইতেছে। তাহা ছাড়া আছে ১৩,০০০ কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক। এই গুলার কথা না ভাবিয়া হা-হুতাশ করিতে থাকিলে কলিকাতাকে অন্যায়ভাবে বাঙালী সমাজের সর্ব্বেসর্ব্বা বিবেচনা করা হইবে মাত্র।

বেঙ্গল ন্যাশন্যালের পতনে বাঙালী ব্যবসায়ীরা সতর্কতার সহিত কাজকর্ম্ম চালাইতে অভ্যস্ত হইবে। যে সকল ব্যবসা-সম্পর্কিত আর চরিত্রগত দোষের দরুণ এই ব্যাঙ্কের দুর্গতি ঘটিল সেই সকল দোষ হইতে আত্মরক্ষা করিবার প্রবৃত্তি যুবক বাঙলায় দেখা দিতে থাকিবে। অধিকন্তু যে সকল ব্যাঙ্ক বাঙালীর তাঁবে পরিচালিত হইতেছে সেই গুলাকে ক্রমশঃ দৃঢ়তর ভিত্তির উপর ঠেলিয়া তুলিবার দিকে আমাদের ব্যবসায়ীরা অগ্রসর হইতে পারিবে। মোটের উপর লাভই দেখিতেছি। ইহার নাম "শাপে বর"।

ব্যাঙ্ক-ব্যবসার দিকে বাঙালী জাতির নজর যে গিয়াছে সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই। ব্যাঙ্কে টাকা গচ্ছিত রাখা, কারবারে ব্যাঙ্কের টাকা খাটানো ইত্যাদি কাজের স্বভাব বাঙালী সমাজে যে ক্রমে ক্রমে বাড়িতেছে তাহাও সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। তবে খাঁটি ব্যাঙ্কের ব্যবসা যত প্রকারের হইতে পারে তাহার অনেক কিছুই এখনো আমাদের এপ্ত হয় নাই।

ব্যাঙ্ক-ব্যবসার আসল কারবারটা কি বা কি কি? মোটের উপর ১৫ প্রকার। কারবারগুলা নিম্নরূপ :—(১) সোনা-রূপার বেচা-কেনা, (২) টাকাকড়ি ভাঙানো বা পোদ্দারি (৩) লোকের টাকাকড়ি জমা রাখা, (৪) যে সকল লোক ব্যাঙ্কে টাকাকড়ি জমা রাখিয়াছে তাহাদের পরস্পর দেনা-পাওনা

কাটাকাটি করা। এ জন্ম টাকার চলাচল আবশ্যক হয় না। ব্যাঙ্কের খাতা-পত্রে একজনের জমা হইতে খরচ লিখিয়া আর একজনের হিসাবে জমা করা হয় মাত্র। খাঁটি ব্যাঙ্কিং বলিলে এই কারবারটার কথাই খুব বেশী মনে পড়ে। ব্যবসায়িমহলে এই ব্যাপার অহরহ চলিতেছে। (৫) ব্যবসাদারদের "চিঠিপত্র" বা কাগজ "ভাঙানো"। বর্ত্তমান জগতে এই কাগজ-বস্তুটার রেওয়াজ খুব বেশী। রামার নিকট টাকা পাইবে শ্যামা। রামা দিল শ্যামাকে একখানা চিরকুট। শ্যামা এই চিরকুটের জোরে আবদুলের নিকট হইতে মাল খরিদ করিল। আবদুল শেষ পর্য্যন্ত রামার নিকট টাকা সমঝিয়া লইতে আসিল। রামার নিকটও আসিবার দরকার নাই। রামা যে ব্যাঙ্কের সঙ্গে কারবার করে সেই ব্যাঙ্কই আবদুলকে চিরকুটটা ভাঙাইয়া দিবে। এই হইল অতি সহজ ধরণের বাণিজ্য-কাগজ। এই চিরকুটটা যখন এক সহর হইতে আর এক সহরে যায় অথবা যখন এক দেশের লোক আর এক দেশের লোকের নামে চিরকুট ঝাড়ে, তখন তাহার নাম হয় আর-কিছু। এই সব পারিভাষিকে সম্প্রতি প্রবেশ করিবার দরকার নাই। তৃতীয় শ্রেণীর "কাগজ" হইতেছে "চেক"। আর এক প্রকার কাগজ হইতেছে গুদামজাত মালপত্রের সার্টিফিকেট বা রসিদ। এই কাগজটা দেখিয়া ব্যাঙ্ক বুঝে যে কাগজওয়ালার তাঁবে অমুক জায়গায় অত পরিমাণ মাল আছে। আবাদের ফসল সম্বন্ধেও এইরূপ গুদামি রসিদ চলিতে পারে। এই সকল রকমারি কাগজ, চিরকুট, হুণ্ডি, চেক, রসিদ ভাঙানো ব্যাঙ্ক-ব্যবসার বড় কাজ। এই দিকে বাঙালীর হাতে খড়ি সুরু হইতেছে মাত্র।

(৬) মক্কেলদের জন্ম ভিন্ন ভিন্ন লোকের নিকট হইতে তাহাদের পাওনা টাকাকড়ি আদায় করিয়া দেওয়া। (৭) এক সহর বা দেশ হইতে অন্ম সহরে বা দেশে টাকা পাঠাইবার জন্ম বাটা আদায় করা হইয়া থাকে। (৮) ভিন্ন ভিন্ন সহরে এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশের রকমারি "কাগজের" সওদা করা। এক স্থানের কাগজ কিনিয়া অন্য স্থানে বেচা হইয়া থাকে। টাকা চলাচলের দরকার উঠিয়া যায় (৪নং দ্রষ্টব্য)। এই ধরণের কাগজ ভাঙাভাঙি করা আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যে একটা মস্ত ব্যবসা। বাঙালী এখনো এই পথের পথিক হইতে শিখে নাই বলিলেই চলে। বর্ত্তমান জগতের ইহা একটা বিশেষত্ব। এই হিসাবে বাঙালীরা এখনো বর্ত্তমান জগতের লোক নয়।

(৮) "কাগজ"গুলা লইয়া অন্যান্য ভাঙাভাঙি ও স্বতন্ত্র কারবার। তাহার একটাকে বলে কাগজ "ডিস্কাউন্ট" করা। আবদুলের সইওয়ালা অর্থাৎ দেনার স্বীকারওয়ালা কাগজটা রামার নিকট হইতে লইয়া কোনো ব্যাঙ্ক যদি তাহাকে তৎক্ষণাৎ নগদ টাকা সমঝিয়া দেয় তাহা হইলে ব্যাঙ্ক কাগজটা "ডিস্কাউন্ট" করিল। এই ডিস্কাউন্ট কাণ্ডে ঝুঁকি অনেক, বলাই বাহুল্য। কিন্তু যে-দেশে ব্যাঙ্ক এই ঝুঁকি লইতে সাহসী হয় না, সেই দেশে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান আছে বলিয়া স্বীকার করা চলে না। এই কষ্টিপাথরে ঘষিলে দেখিব বাঙালীসমাজ এখনো প্রায় ব্যাঙ্ক-হীন অবস্থায়ই যেন রহিয়াছে।

কাগজ ভাঙাইবার আর এক কায়দাকে ফরাসীতে বলে "আক্‌সেপ্‌তাঁস", জার্মাণে "আকৎসেপ্‌ট্‌," আর আমাদের চলতি ইংরেজি "অ্যাকসেপ্ট্যান্স"। সোজা কথায় কাগজ স্বীকার করা বুঝিতেছি। এই "স্বীকার" বা "গ্রহণ" করাটা নগদ টাকা দিয়া দেওয়ার সামিল নয়। ব্যাঙ্ক কাগজটার উপর সহি দিয়া বলে মাত্র,—"যদু, তোর মালপত্র বা সম্পত্তি বা পুঁজি সম্বন্ধে আমার বিশ্বাস আছে"। যদু ব্যাঙ্কের এইরূপ সহিওয়ালা চিরকুট লইয়া অন্য এক ব্যাঙ্কের নিকট হইতে নগদ টাকা পাইতে পারে। এই দ্বিতীয় ব্যাঙ্ক "ডিস্কাউন্ট" করিল,—প্রথম ব্যাঙ্কটা করিয়াছে মাত্র "অ্যাকসেপ্ট" অর্থাৎ স্বীকার, গ্রহণ বা বিশ্বাস। নগদ টাকা দিল দ্বিতীয় ব্যাঙ্ক প্রথম ব্যাঙ্কের ঝুঁকিতে। যদি যদুর অবস্থা কাহিল হয় তাহা হইলে স্বীকারকারী প্রথম ব্যাঙ্কের ঘাড় ভাঙা হইবে। কাজেই "আকসেপ্‌তাঁস" ব্যবসাটা গুরুতর রকমের।

(৯) চলতি হিসাবের খাতাপত্র রাখা। বাজার হইতে মক্কেলদের জন্য তাহাদের পাওনা টাকা উসুল করা আর মক্কেলদের পক্ষ হইতে তাহাদের দেনা শুধিয়া দেওয়া ব্যাঙ্কের এই শ্রেণীর কাজ। সংখ্যা এবং পরিমাণ হিসাবে এই কাজ খুবই বেশী,—কেননা প্রত্যেক মক্কেলের জন্য প্রতিদিনই এই ধরণের কাজ কিছু না কিছু সামলাইতে হয়ই হয়। ব্যাঙ্কের খাতায় প্রতিদিনই মক্কেলদের জমাখরচের হিসাব চলিতে থাকে।

(১০) নোট ছাড়ার কাজ। যে যে লোককে টাকা দিতে হইবে তাহাদিগকে নগদ টাকা না দিয়া একটা প্রতিজ্ঞাপত্র দেওয়ার নাম নোট জারি করা। আগেকার দিনে একাধিক ব্যাঙ্কের এই ক্ষমতা ছিল। কিন্তু প্রায় সকল দেশেই গবর্ণমেণ্ট এই ব্যবসাটা শেষ পর্য্যন্ত কোনো একটা নির্দ্দিষ্ট ব্যাঙ্কের একচেটিয়া কারবারে পরিণত করিয়া দিয়াছে। প্রতিজ্ঞাপত্র বা নোট জারি

করিবার নিয়ম-কানুন বিলাতে, জার্ম্মাণিতে এবং ফ্রান্সে পৃথক পৃথক। বাঙালী এই ব্যবসা একদম জানেই না। আর জানিবার সম্ভাবনাও আমাদের নাই। তবে এখন ভারতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিল। এই হিড়িকে দেশের লোকের ভিতর নোট, কাগজী টাকা, নোট-ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্কের প্রতিজ্ঞা-পত্র ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা এবং তর্কপ্রশ্ন সুরু হইতেছে।

(১১) সওদাগরি মাল বা মাল চালানের রসিদ বন্ধক রাখিয়া মক্কেলকে টাকা দেওয়া। চাষ আবাদের ফসল সার্ব্বজনিক গোলায় ("ধর্ম্মগোলায়") বন্ধক রাখিয়াও ব্যাঙ্ক চাষীদিগকে নগদ টাকা দেয়। (১২) এই ধরণের তৃতীয় বন্ধকি কারবার হইতেছে জমিজমার বন্ধকে টাকা দেওয়া। সকল প্রকারের বন্ধকি রসিদই অন্যান্য বাণিজ্য-চিরকুটের মতই বাজারে কেনা-বেচা চলে। আর এই কেনা-বেচার কাজও ব্যাঙ্কে করা হয়। এই সকল বিষয়ে চর্চ্চা বাংলাদেশে কিছু কিছু সুরু হইয়াছে। কিন্তু কাজ বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই।

(১৩) রেল-কোম্পানী, শিল্প-কারখানা, বা ঐ জাতীয় কারবারের সঙ্ঘেরা বাজারে টাকা ধার করিতে চাহিলে তাহাদের হইয়া ব্যাঙ্ক ঐ কর্জ্জ চায় কিংবা এই সঙ্ঘের "শেয়ার" বেচিবার ভারও ব্যাঙ্কেরা লইয়া থাকে।

(১৪) বাজারে জনসাধারণের নিকট হইতে "কর্জ্জ" না চাহিয়া অথবা জনসাধারণের নিকট "শেয়ার" বেচিবার চেষ্টা না করিয়া ব্যাঙ্কগুলা খোদই কারবারী সঙ্ঘগুলাকে কর্জ্জ দেয় এবং তাহাদের শেয়ার খরিদ করে। এই সব "এলাহি কারখানা" বাঙালীর পক্ষে সম্প্রতি সুদূর ভবিষ্যতের কথা। ফ্রান্সেও সকল ব্যাঙ্ক এই সব দিকে মাথা খেলাইতে সাহস পায় না। এজন্য ট্যাঁকে টাকার জোর থাকা চাই খুবই বেশী।

(১৫) ষ্টক-এক্‌স্‌চেঞ্জে যত রকমের "কাগজ" লইয়া লেনাদেনা চলে তাহার ভিতর নাক গুঁজিয়া রাখাও ব্যাঙ্কের এক বড় কারবার। ষ্টক-বাজারের দালালদের সঙ্গে ব্যাঙ্কের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সৃষ্ট হয়। মক্কেলদের জন্য নানা প্রকার কাগজ কেনা-বেচা করিতে করিতে ব্যাঙ্কগুলাকে খানিকটা জুয়াড়ি হইয়া পড়িতে হয়। ইহাতে ঝুঁকির পরিমাণ প্রচুর। বাঙালী ব্যাঙ্কের পক্ষে এই কারবার সম্প্রতি স্বপ্নাতীত।

অবশ্য কোনো একটা ব্যাঙ্কের পক্ষে এই ধরণের সকল প্রকার কারবারে হাত দেওয়া সম্ভবপরও নয় আর অনেক ক্ষেত্রেই যুক্তিসঙ্গতও নয়।

বাঙলাদেশে বাঙালীর তাঁবে আধ-কোটি বা কোটি টাকা মূলধনের ব্যাঙ্ক অল্পকালের ভিতরই গড়িয়া উঠিতে পারিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। মফঃস্বলের বিভিন্ন ব্যাঙ্কের সমন্বয়ে এক একটা "কেন্দ্রীকৃত" ব্যাঙ্ক গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা আছে। বিলাত, জার্ম্মাণি, আমেরিকা ইত্যাদি দেশের ব্যাঙ্ক-গঠন গত শতাব্দীতে ধাপের পর ধাপে যে-প্রণালীতে উঠিয়াছে ভারতেও সেই প্রণালীরই দিগ্‌বিজয় দেখিতে পাইব। বাঙলার আর্থিক অভিজ্ঞতা পাকিয়া উঠিতেছে। যুবক বাঙলাকে অনতিদূর ভবিষ্যতে বড় বড় পুঁজিওয়ালা ব্যাঙ্ক পরিচালনার দায়িত্ব লইতে হইবে। সম্প্রতি এই বিষয়ে আর কিছু বলিতে চাই না।

তবে সুধু একটা প্রস্তাব করিব। বাঙলা দেশে আজকাল ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ে অন্ততঃপক্ষে হাজার চার পাঁচ লোক লাগিয়া আছেন। কেরাণী হিসাবে, ম্যানেজার হিসাবে, খাতাপত্রের পরীক্ষক হিসাবে আর ডিরেক্টর হিসাবে এতগুলি বাঙালী ব্যাঙ্ক লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিতেছে। এই সকল অভিজ্ঞতাওয়ালা লোকের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। মফঃস্বলের কোনো কোনো কেন্দ্রে অথবা কলিকাতায় তাঁহারা মাঝে মাঝে সম্মিলিত হইতে থাকুন। বাঙালী ব্যাঙ্কের বর্ত্তমান অবস্থা আর তাহা উন্নত করিবার উপায় সম্বন্ধে কর্ম্মদক্ষ ও চিন্তাদক্ষ লোকেরা মিলিয়া মিশিয়া পরামর্শ করুন। "বঙ্গীয় ব্যাঙ্ক-সঙ্ঘ" নামে একটা প্রতিষ্ঠান এই আয়োজনের দায়িত্ব লইতে পারে।

## ৯। কারবার-পরিচালনা

আজকালকার দুনিয়ায় চলিতেছে "কার্টেল" আর "ট্রাষ্ট" নামক আর্থিক গড়নের যুগ। সে ধাপটা যুবক বাঙলার পক্ষে এত উঁচু যে তাহার দিকে তাকাইতে গেলেও ভীমরতি লাগিবার ভয় আছে। ঠিক যেন শিলিগুড়িতে হিমালয়ের পায়ে দাঁড়াইয়া খাড়া ২৯,০০২ ফিটের ডগাটা দেখিবার প্রয়াস আর কি!

তবে কী মাসে বাঙলার জেলায় জেলায় দুচারটা জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানী গড়িয়া তোলা আমাদের পক্ষে এখনি সম্ভব। এই ধরণের লিমিটেড কোম্পানীকে আমি ডরাই না। এই সব হজম করিবার ক্ষমতা বাঙালী জাতির হাড়-মাসে আছে।

কিন্তু আমার বিবেচনায় এখনও অনেক দিন পর্য্যন্ত ব্যক্তিগত কারবার আর পরিবারের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ "পার্টনারশিপ"ই বাঙালীর শিল্প-বাণিজ্যের গড়ন নিয়ন্ত্রিত করিতে থাকিবে। আপ্‌সে-আপ্‌ স্বাধীনভাবে কারবারে নামিবার প্রয়াসই সহজসাধ্য বিবেচিত হইবে।

পুঁজি সম্বন্ধে কোটি কোটি টাকার স্বপ্ন দেখা আমার দস্তুর নয়। অল্প-কালের ভিতর লাখ লাখ টাকার কারবারও যুবক বাঙলায় তাঁবে বড় বেশী চলিবে বলিয়া বিশ্বাস করি না। যে সকল শিল্প-বাণিজ্যের ফর্দ্দ দিয়াছি তাহাতে মোটের উপর গড় পড়তা ৫।১০।১৫ হাজার টাকার মামলা। পাঁচ লাখ টাকা হইতেছে সম্প্রতি আমার বরাদ্দে চরম সীমা। অবশ্য যে-ব্যক্তি বা যে-কোম্পানী যত বেশী টাকা ঢালিতে পারিবে তাহার পক্ষে তত বেশী বাঁচিয়া থাকিবার সুযোগ সৃষ্ট হইবে। আর লাভের সম্ভাবনাও তেমন তেমন বাড়িবে। "যত গুড় তত মিষ্টি"। বিশেষতঃ পাটের কল, তুলার কল, সূতার কল, রেশমের কল, কাপড়ের কল চালাইতে হইলে বেশী টাকার হাঁকই অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু আগামী কয়েক বৎসরের ভিতর ২০।২৫ লাখ টাকা-ওয়ালা বাঙ্গালী কল দুচারটা মাথা তুলিতে পারিবে কিনা এখনো বুঝা যাইতেছে না।

কারবার-পরিচালনায় ও আধ্যাত্মিক শক্তির দরকার হয়। আজকালকার দিনে কোনো ব্যবসাই একমাত্র বা প্রধানতঃ টাকার জোরে চালানো সম্ভবপর নয়। বাঙলার জমিদার আর লক্ষপতিরা এই কথাটা বেশ মনে রাখিবেন। চাই বিদ্যা, চাই অভিজ্ঞতা, চাই কর্ম্মদক্ষতা।

এই জন্য আবশ্যক প্রায় প্রত্যেক আধুনিক কারবারেই প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর মাথা ও হাত। এঞ্জিনিয়ার তাহাদের অন্যতম। রাসায়ণিকের ইজ্জৎ এঞ্জিনিয়ারেরই সমান। আর তৃতীয় শ্রেণীর লোক হইতেছে ধনবিজ্ঞানবিৎ বাজার-দক্ষ ম্যানেজার গোত্রের অন্তর্গত। এই তিন জাতীয় লোক বা বিদ্যার সমন্বয় যেখানে নাই সেখানে প্রায় সকল কারবারই ঠুঁটো হইয়া থাকিতে

বাধ্য। কোনো সব-জান্তা এঞ্জিনিয়ার বা সব-জান্তা রাসায়ণিক বা সব-জান্তা ধনবিজ্ঞানবিদের পাল্লায় পড়িলে পুঁজিপতি মহাশয় পটল তুলিবেন, একথা জোর করিয়া বলা যায়। বিগত বিশ বাইশ বৎসরের স্বদেশী আন্দোলনে আমাদের আর্থিক অভিজ্ঞতায় যে সকল অকৃতকার্য্যতার তালিকা পাওয়া যায় তাহার সব কয়টাই একমাত্র নৈতিক দোষের কুফল নয়। অনেক ক্ষেত্রেই সব-জান্তা "এক্স্‌পার্ট" বা ওস্তাদের দৌরাত্ম্য অথবা বিভিন্ন কর্ম্মদক্ষতায় সমবায়ের অভাব এই সকল অকাল-মৃত্যুর প্রধান কারণ।